ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক রচিত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ গৌর-পূর্ণিমা ১৯৮৮, ১০,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জন্মাষ্টমী ১৯৯২, ১০,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ ঃ গৌর পূর্ণিমা ১৯৯৫, ১০,০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ
গীতার গান
শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৭ খণ্ড)
বৈরাগ্য-বিদ্যা
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
শ্রীকপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
অনুপম উপহার
ঈশোপনিষদ
পাশ্চাত্যে কৃষ্ণভক্তির প্রচার
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ (৩ খণ্ড)
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
ভক্তিকথা
ভক্তিরত্নাবলী
বুদ্ধিযোগ
ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
জ্ঞান কথা
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
১এ রেইনি পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০১৯

প্রস্তাবনা

স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের বন্যায় সারা ভারতকে প্লাবিত করেছিলেন, সেই বন্যায় জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করেছেন। মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥"

শ্রীল প্রভুপাদের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থক রূপ দান করলেন। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলেই বুঝতে পারা যায় যে শ্রীমদ্ এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হচ্ছেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। 'ভগবদ্গীতায়' ভগবান বলেছেন—

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।'

নির্বোধ মানুষেরা মনুষ্যরূপ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে, তাঁকেও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে অবজ্ঞা করে। এই ভগবদবজ্ঞা বা ভগবদ্বিদ্বেষই হচ্ছে মানুষের দুঃখের মূল কারণ। কিন্তু মূঢ়মতি মানুষেরা ভগবানকে অবজ্ঞা করলেও অপার করুণাময় ভগবান সর্বদাই মানুষকে তার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য নানারকম চেষ্টা করে চলেছেন। কখনো তিনি নিজে এসে জড়-বন্ধন মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন, কখনো বা তিনি তাঁর শুদ্ধ-ভক্তকে প্রেরণ করে তাঁর মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করেছেন। মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়ে, তিনি কলিযুগের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সংকীর্তন যজ্ঞ করার মাধ্যমে জড়-বন্ধন-মুক্ত হবার পথ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী করে 'শ্রীমদ্ভাগবতে' বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃসংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

[ভাঃ ১১/৫/৩১]

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরসুন্দর রূপে তাঁর সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদ সহ কলিযুগে অবতীর্ণ হবেন, এবং সুমেধা—সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সংকীর্তন-যজ্ঞ দ্বারা তাঁর আরাধনা করবেন।

এই যে ভগবান অবতরণ করলেন, তাঁকে ক'জন চিনতে পারল? তাঁর মনুষ্যরূপ লীলাবিলাস দেখে, মূর্খ মানুষেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাদের মুক্তির পথ চিরতরে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। শ্রীল প্রভুপাদ এসে আমাদের চিনিয়ে দিলেন যে এই গৌরসুন্দরই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকেরাও আজ পরম প্রেমাস্পদ ভগবানকে চিনতে পেরে তাঁর সেবায় আত্মোৎসর্গ করল। এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবীকে কৃষ্ণ-ভাবনামৃত আন্দোলনে আন্দোলিত করলেন—ভগবৎ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করলেন।

জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। তিনি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত বলে তাঁকে বলা হয় অধোক্ষজ। সূর্যের রশ্মির মাধ্যমে যেমন সূর্যকে দর্শন করা যায়, তেমনই ভগবৎ-কৃপার মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। যাঁরা সেই কৃপাশীষ লাভ করেন, তাঁরাই শুদ্ধ বৈষ্ণব—প্রকৃত মহাপুরুষ—সদ্গুরু। তাঁরাই কেবল পারেন ভগবত্তত্ত্ব বর্ণনা করতে।

অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে শ্রীল প্রভুপাদ জগৎকে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। সারা বিশ্বে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করার জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন, তাই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের বোধগম্য ইংরেজী ভাষাতে তিনি অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমেও কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণ করে গেছেন। 'ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলীর' সবক'টি প্রবন্ধই 'গৌড়ীয়' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 'করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের গৌড়ীয় পত্রিকাতে। শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর কলিহত জীবের কি উপকার করেছেন সেই শিক্ষা শ্রীল প্রভুপাদ দান করেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার প্রয়োজন শিক্ষা দিয়েছেন।

'জটিল সমস্যা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে গৌড়ীয় পত্রিকার ৭ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায়। ভগবদ্বিমুখ হয়ে মানব সমাজ কিভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে

চলেছে সে সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে সচেতন করেছেন। অন্ন, শিক্ষা, বায়ু-সঞ্চালিত হাড় মাংসের থলিবিশেষের জড় দেহটিকে 'আমি' বলে মনে করার ফলে যে জড়-বুদ্ধির উদয় হয়, তাই হচ্ছে এই জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। এই জটিল সমস্যার হাত থেকে জগৎকে রক্ষা করবার জন্য জীবকুলের যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষীদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীনাম মহামন্ত্ররূপ অস্ত্র ধারণ করে এই জগৎকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন।

'ভাগবত-জীবন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে গৌড়ীয় পত্রিকার ৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ এবং ৭ম সংখ্যায়। দুর্লভ মনুষ্য জন্মের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে ভগবানের শরণাগত হওয়াই যে একমাত্র কর্তব্য, এই প্রবন্ধে তিনি সেই পরম শিক্ষা দান করেছেন।

'বসুধৈব কুটুম্বকম্' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের গৌড়ীয় পত্রিকার ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায়। আধুনিক যুগে সকলেই বিশ্বপ্রেমের কথা বলে কিন্তু যথার্থ বিশ্বপ্রেম লাভ করা কিভাবে সম্ভব তা প্রায় কেউই জানেনা। শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রবন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই বিশ্বপ্রেম কি, এবং কিভাবে তা লাভ করা যায়।

'শ্রীগোপালজীর ভক্তিযোগ' প্রথম প্রকাশিত ১৯৫৫ সালে গৌড়ীয় পত্রিকার ৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায়। এটি ভগবদ্ভক্ত গোপালজীর অলৌকিক জীবনালেখ্য।

পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই প্রবন্ধগুলি অপ্রাকৃত মাধুর্যে পরিপূর্ণ। শ্রীল প্রভুপাদের সুললিত ভাষা এবং সাবলীল বর্ণনায় দুর্বোধ্য ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য হয়েছে। যারা যথার্থ বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান তাঁরা এই অমৃতময় গ্রন্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার করে তাঁদের দুর্লভ মানব জন্মকে সার্থক করে তুলবেন সেইটাই আমরা কামনা করি।

নিবেদক

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির — শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া। — ত্রিদণ্ডিভিক্ষু জয়পতাকা স্বামী।

শ্রীচৈতন্যদেব ও সাম্যবাদ

সর্বোদয় সমাজ, শ্রেণীবিহীন সমাজ, সমাজ-বাদ, সাম্য-বাদ, ইত্যাকার বহুবিধ পরিকল্পনা মনুষ্য-সমাজের কল্যাণকল্পে উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত কল্পনার ভিতরই যে একটা "গলদ" রহিয়াছে, তাহা ধরিবার ক্ষমতা আমাদের হয় নাই। মনুষ্যমাত্রই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব এই দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্ট হওয়ায়, উপরিউক্ত প্রত্যেক কল্পনাটিই যে অসম্পূর্ণ ও দোষ-যুক্ত, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতাগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মনুষ্য-সমাজের হিতকল্পে যে কোন কল্পনা করুন না কেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, উপরিউক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্তী হওয়ায় তাঁহাদের প্রত্যেক কল্পনাটিই আংশিক বা ক্ষণিক-সত্যের ছায়া মাত্র; সার্বভৌম মঙ্গলময় হইতে পারিতেছে না। সুতরাং প্রত্যেক কল্পনাটিই অপর কল্পনাটির মত ক্ষণভঙ্গুর, অস্থায়ী এবং নিত্য কার্যকরী নহে।

মহাত্মা গান্ধী যে পরিকল্পনা জগতের মধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাও যে উক্ত দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত হয় নাই—ইহা আমাদের অনুধাবন করা উচিত। পরলোকগত মহাত্মা গান্ধীর মত নিষ্কপট কর্মী, আস্তিক এবং নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ব্যক্তি আধুনিক জগতে অত্যন্ত বিরল বলিলেই চলে। তথাপি তাঁহারও পরিকল্পনা—উক্ত দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্ট হওয়ায় অসম্পূর্ণ ও ক্ষণিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনায় ভারতে হিন্দু-মুসলমানের একতা এবং অহিংসা-নীতির উৎকর্ষ সাধনই মূল মন্ত্র ছিল; কিন্তু এই দুইটি উদ্দেশ্যই যে কোনও কারণে হউক বিধ্বস্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত হিংসা-নীতিতেই কবলিত হইয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমানের বিভৎসভাবে পৃথক হইয়া যাওয়াই মহাত্মাকে দর্শন করিয়া যাইতে হইয়াছে। শেষ জীবনে তিনি স্বরাজ্য লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই—ইহাই আমাদের সত্য অনুমান। আমাদের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট যতপ্রকারই মনুষ্য-সমাজের হিতকারী পরিকল্পনা হউক না কেন, তাহা পরিণামে কোনদিনই কার্যকরী হইবে না।

সাম্যবাদ, সর্বোদয় সমাজ বা শ্রেণী-বিহীন সমাজ তখনই সাধিত হইতে পারে, যখন মনুষ্যজাতি উক্ত দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত হয় এবং সেই মুক্ত অবস্থাতেই যে পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়, তাহা 'শ্রীভগবদগীতায়' এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥
(গীঃ ৫/১৮)

সমাজের ভিতর যখন বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং গরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডালকে এক পর্য্যায়ে দর্শন হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে—সর্বোদয়-সমাজ বা শ্রেণী-বিহীন সমাজ সার্থক হইয়াছে। উক্ত দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট ব্যক্তিগণ কোনদিনই প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু বা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেশের যে কোন পশুপক্ষী বা চণ্ডালের সহিত কোনও অংশেই এক করিয়া মানিতে পারিবে না।

আমরা যতই সাম্যবাদ প্রচার করি না কেন, আমরা সকলেই উক্ত দোষ-চতুষ্টয়ে দূষিত বলিয়া আমাদের সাম্যবাদ কখনই বিশুদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীভগবদগীতায় উক্ত শ্লোকের দ্বারা যে সাম্যবাদের কথা কথিত হইয়াছে, তাহা কি আমরা চিন্তা করিয়া থাকি? ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন যে, জগতে যত প্রকার জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, জলচর-খেচর-ভূচর ইত্যাদি প্রাণী আছে, সকলেরই জন্মদাতা পিতা শ্রীভগবান। ভগবানের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা যে মনগড়া 'সর্বোদয়' সমাজের চিন্তা করি, আমরা যে স্বদেশবাসীর চিন্তা করি, তাহাতে কি ঐ প্রকার সার্বজনীন চিন্তাধারা আছে? আমরা কি চিন্তা করি যে, আমাদের দেশে যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় মনুষ্যজীব আছে, সেইগুলি ছাড়া তাহা অপেক্ষাও শত শত জীবগণ কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীরূপে এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে? আমাদেরও যেমন দেশের উৎপন্ন শষ্যাদির দ্বারা জীবন ধারণ করিবার অধিকার আছে, তাহাদেরও সেই প্রকার অধিকার আছে। ভগবান যেমন সকল জীব-জন্তুর পিতা বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিয়াছেন, সেই প্রকার তিনি সকলেরই আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা দেশের কয়েকটি মনুষ্যের জন্যই কেবল রাজ্যপাল, দেশপাল, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, নিসিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা প্রভৃতির বহু

ব্যবস্থাই করিয়া থাকি। কিন্তু মুষ্টিমেয় মনুষ্য ছাড়া আর যে সমস্ত ভগবানের সন্তান আছে, তাহাদের কথা ত ভাবিই না; পরন্তু তাহারা আমাদের মত দলবদ্ধ হইয়া গলাবাজী করিতে পারে না বলিয়া, তাহারা নিরীহ নিরুপায় বলিয়া আমরা তাহাদের অবাধে হত্যা করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করিয়া তথাকথিত 'সর্বোদয়'-সমাজের পরিকল্পনা করিয়া থাকি। এই প্রকার খণ্ড 'সর্বোদয়'সমাজ কোনদিনই জগতের মঙ্গল আনিতে পারিবে না। সর্বোদয় সমাজের পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, জগতে যথার্থ বা পূর্ণ সাম্যবাদ স্থাপিত করিতে হইলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রদর্শিত পথেই আমাদের অনুগমন করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব যে সর্বোদয়-সমাজের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা জীবজন্তু, মনুষ্য, পশু-পক্ষী নির্বিশেষে সকলেরই উপযোগী। তিনিই সর্বজীবে সম-দয়া অমন্দ-উদয়া দয়া করিতে পারেন। অতএব 'সর্বোদয়-সমাজে'র পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ নিজ পরিকল্পিত দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্তী না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবকে যথাযথ দর্শন করিয়া সকলেই অনুনয়-বিনয় করিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, যথা—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদেগৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছেন যে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।" যতপ্রকার পরিকল্পনা আছে, তাহাতে আমাদের দাসখত লিখিতেই হইবে। আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করি, তখন বিদেশী ব্যক্তির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া স্বদেশী লোকের দাসত্ব গ্রহণ করি। যখনই কোন পরিকল্পনার বশবর্তী হইয়া নিজেকে উপাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলি, তখনই আমরা সেই সেই পরিকল্পনা-কারীর চরণে দাসখত লিখিয়া দিতে বাধ্য হই। সেই প্রকার দাসখত লিখিয়া দিয়া যখন দেখি—আমার অসুবিধা হইতেছে, তখনই আবার আর এক পরিকল্পনার অনুগামী হইয়া দাসখত লিখিয়া দেই। এইভাবে আমাদের স্বাভাবিক দাস-ভাবকে মায়ার পরিকল্পনায় স্বাধীন হইবার জন্য কেবল খণ্ড দাসত্বেই পরিণত করি। যিনি যত বড়ই হোমড়া-চোমড়া হউন না কেন, তাঁহার দাসত্ব করা ব্যতীত কোন উপায়ই নাই। যিনি বাড়ীর কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া আছেন,

তিনি ব্যতিরেকভাবে সমস্ত বাড়ীর লোকেরই দাসত্ব করেন। পরিবারের কাহারও কিছু ত্রুটি হইলে তাঁহাকেই দায়ী করা হয় এবং সকলের দাসত্বে সমভাবের অভাব হইলেই তিনি আর বেশীদিন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও দেখা যায়—আজ যিনি মুখ্যমন্ত্রী, কাল তিনি দেশের মুখ্য শত্রু এবং কারাবাসী ; কারণ, তাঁর দাসত্বের ত্রুটি হইয়াছে। দোকানদার খরিদ্দারের দাস, খরিদ্দার দোকানদারের দাস। স্বামী স্ত্রীর দাস, স্ত্রী স্বামীর দাসী. চাকর মনীবের দাস, মনীব চাকরের দাস। চাকর না হইলে মনীবের চলে না, মনীব না হইলে চাকরের চলে না। এইভাবে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, দেখিব—প্রত্যেক জীবই খণ্ডভাবে অপর জীবের দাস। কিন্তু মায়ার প্রভাবে সে সর্বদাই মনে করে—আমি স্বাধীন বা মনীব। সেই স্বাধীনতা পূর্ণভাবে আমরা পাইতে পারি, যদি আমরা আমাদের নিত্য-দাসভাব সেই পূর্ণভোক্তা ভগবানের দাস্যভাবে নিযুক্ত করি। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, যে সকল নেতাগণ জগতের শুভ কামনায় নিজদিগকে বিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা যেন শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত সাম্যবাদের বিচার করেন।

করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু—'করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' মহাবদান্য-অবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। সুতরাং প্রভুর অন্তরে কখন কি ভাব উদয় হইয়া আহ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হয়, তাহা সেই অন্তরঙ্গ সেবক ছাড়া কে বুঝিতে পারে ? সেই প্রকার অন্তরঙ্গ ভক্তের পাদপদ্মের রজোভিষেক ভিন্ন শ্রীমন্মমহাপ্রভুর গম্ভীর লীলা কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সর্বদাই সাবধানে সেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নির্বিঘ্নে নিজ সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীল রূপ-রঘুনাথের আশীর্বাদ ভিন্ন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক-লীলা-কেহ বুঝিতে পারিবেনা বলিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী সকল জীবকে আশীর্বাদ করিলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

(বিদগ্ধমাধব ১/২)

শ্রীশচীনন্দন হরি গৌরসুন্দর "করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ"—এই অবতরণ কার্য্য দ্বারা কলিহত জীবের কি উপকার করিয়াছেন, জগতের তাহা এখনও জগতের লোকে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁর "করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ"—এই কথা জানাইবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন এবং ভারতবাসী সকলকেই এই কার্য্য করিবার জন্য ঢালা হুকুম দিয়া গিয়াছেন।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৯/৪১)

রূপানুগ সমস্ত আচার্য্যগণ—মহাপ্রভুর ঐ আদেশ সকলকে জানাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অপূর্ব গ্রন্থাদি রচনার দ্বারাও এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ যে বিষয়ে ক্রিয়াত্মক চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁরই বিচার-ধারা রক্ষা করিয়া তাঁর উপযুক্ত শিষ্যবর্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জগতে জানাইবার জন্য চেষ্টা করিলে হয়ত এত দিন শ্রীগৌরসুন্দরের কথা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করিতে পারিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় কি অমৃত আছে, তাহা এখন জগতের শিক্ষিত সমাজ জানিবার জন্য খুবই উৎসুক। এ বিষয়ে আমাদের পরিচিত এবং মাস্টারমশাই মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন তাঁর বাড়ীতে আমাদের আলাপ পরিচয়ের সময়ে আমাদের সুযোগ্য সতীর্থ ডাঃ সম্বিদানন্দ দাস ব্যারিষ্টার মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় ডাঃ কালিদাস নাগ—আমাদের একপ্রকার তিরস্কার করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, "অমুক মিশনের কোনই শ্রবণযোগ্য কথা না থাকিলেও তারা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সেই কথা প্রচার করিয়াছে; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর এত বড় কথা তোমরা এখনও বাঙ্গলা দেশের বাহিরেও দিতে পার নাই।"

ইহা কত বড় অযোগ্যতার পরিচয় তাহা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। 'হাম বড়া' মনে করিয়া ২১৪টি মঠ-মন্দির স্থাপন করা এবং কতিপয় শিষ্য সেবকাদি পাইয়া জাত গোঁসাইর সঙ্গে পাল্লা দিলেই মহাপ্রভুর কথা প্রচার হয় না। মহাবদান্য অবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যাহাতে কলিহত জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রকাশমান হন, সে বিষয়ে আমাদের সমবেত চেষ্টা করা ব্যতীত এই কার্য্যের সমাধান হয় না। ইহাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের শেষ কথা। সকলে মিলিয়া যাহাতে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা তিনি করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সেই কথাটি বাদ দিয়া আর সব কথা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর 'ভগবদগীতার' সারার্থবর্ষিণী টীকায় 'ব্যবসায়াত্মিকা' (২/৪১) শ্লোকের এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্‌গুরুপদিষ্টং ভগবৎ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য দশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে

কার্য্যমেতদন্যং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষনীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ; যদুক্তং—"ততো ভজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালু-দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইতি।

অর্থাৎ ভক্তিমার্গে ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একটি মাত্র এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে বাণী প্রাপ্ত হই তাহারই সাধন। গুরুপাদপদ্ম হইতে ভগবৎকীর্ত্তন সম্বন্ধে যে আজ্ঞা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি সেই আজ্ঞা পালন করাই আমাদের একমাত্র সাধ্য ও সাধন এবং যাবজ্জীবন সেইভাবে চেষ্টা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। সাধ্য-সাধন দশায় কোন সময়েই আমরা গুরু-পাদপদ্মের কথা অবহেলা করিতে পারি না। কারণ আমাদের জীবনের একমাত্র কাম্য গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে তাঁর সেবা করা এবং সেই কার্য্য ছাড়া স্বপ্নেও আমাদের অন্য অভিলাষ করা কর্তব্য নহে। তাহাতে যদি আমাদের সুখ হয় হউক, দুঃখ হয় হউক, সংসার ক্ষয় হয় হউক, না হয়—নাই হউক, তাহাতে কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমাদের একমাত্র কর্তব্য গুরু-পাদপদ্মের সেবা এবং তাহাই আমাদের 'নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি' এবং দৃঢ় শ্রদ্ধার পরিচয়। সেইপ্রকার দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত গুরুসেবা বা ভগবৎ সেবাই ভক্তি; অন্যথায় "আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি।"

ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদকে যখন ঔরঙ্গজেব পিতৃভক্তি সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা মুখে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন মহম্মদ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"আপনার কাছে কি পিতৃভক্তি শিখিতে হইবে?" অর্থাৎ ঔরঙ্গজেব নির্জপিতা সাজাহানকে বন্দী করিয়া তাঁর সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। সেজন্য পিতৃভক্তির চরম পরিচয় দানকারী ঔরঙ্গজেবের পিতৃভক্তি শিক্ষার উপদেশ তাঁর পুত্র শুনিতে রাজী হয় নাই। ইহাই স্বাভাবিক। বল্লভ ভট্ট তাঁর ভাগবত-টীকা শ্রীধর স্বামীর টীকাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিলে শ্রীগৌরসুন্দর হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন—

"প্রভু হাসি' কহে—"স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা ৭/১১১)

ভগবদ্‌গীতায় "আচার্য্যোপাসনা" পারমার্থিক জ্ঞানের প্রধান সোপান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্য এবং সাক্ষাৎ গুরুদেবের কথা

অমান্য করিয়া কেহ গুরুর আসনে বসিলে তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আবদ্ধ করুণাসিন্ধুর মোহনা কাটিয়া যথাতথা প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় প্রতারিত সপ্তগ্রামে সুবর্ণ-বণিককুল সমাজে নিকৃষ্ট হইলেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সকলের ঘরে ঘরে যাইয়া তাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। "মূর্খ বণিককুল করিলেন উদ্ধার।" ভগবদ্ভক্তির অধিকারী সকলেই এবং তাহাতে জাতিকুলের কোনও বিচার নাই, এইভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সকলকেই প্রেম দান করিলেন। মধ্যে সেই নিত্যানন্দের কুলধ্বজ নামধারী জাতি গোস্বামীগণ সেই করুণাসিন্ধু আবার আবদ্ধ করিয়া দিলেও—সাক্ষাৎ নিত্যানন্দের দ্বিতীয় স্বরূপ এবং গৌর-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ পুনরায় খুলিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তিনি যে-ভাবে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন ঠিক সেই ধারাতেই শুদ্ধভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য-বর্গকে সেইভাবে সকলে একত্রে মিলিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিবার আদেশ করিয়া গেলেন, কিন্তু যে কোন দুর্দ্দৈব কারণবশতঃ হউক সেই মন্দাকিনীর ধারা আবার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; আমাদের সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত যেন ভক্তিবিনোদ মন্দাকিনী-ধারা রুদ্ধ হইয়া না যায়।

'শ্রীমদ্ভাগবতে' দেখিতে পাওয়া যায় নৈমিষ্যারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ একত্রিত হইয়া যথার্থ বৈষ্ণবোচিত চিন্তাধারায় কলিহত জীবের জন্য কিংকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছিলেন। শৌনকাদি-ঋষিগণ কলিহত জীবের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দ-মতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥"

[ভাঃ ১/১/১০]

কলিকালের জীব সকলেই অল্পায়ু, অলস, পাষণ্ডমতি, বিঘ্নাকুল এবং রোগ-শোকাদিদ্বারা সর্ব্বদাই উপদ্রুত। এ-হেন অবস্থায় তাদের কিভাবে মঙ্গল হয় তাহা তাঁরা চিন্তা করিয়াছিলেন। "শ্রীমদ্ভাগবতে" দ্বাদশ স্কন্ধে কলিযুগের মনুষ্য-জাতির দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন—"কলিকালে যত দিন যাইবে ততই ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু এবং স্মৃতি—এইগুলি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া

যাইবে।" এগুলি আমরা ক্রমশঃই উপলব্ধি করিতেছি। ধর্ম বলিতে 'নামকাবাস্তে', সত্য কথা বলিলে পেটে অন্ন জুটিবে না! শৌচ ত' নাই-ই, কারণ রাস্তা-ঘাটে, হোটেলে, দোকানে সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাচারে পরিপূর্ণ। ক্ষমা কি জিনিষ তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে অথবা তাহা ভীরুতা, কাপুরুষতা আখ্যালাভ করিয়াছে। নিজের গৃহস্থলীর ভিতরই পরস্পরের ক্ষমা নাই। দয়া একটা গল্পের মত। আয়ুরতো কথাই নাই! বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে গড়পড়তা ৩৫ বৎসর মাত্র আয়ু এবং স্মৃতি বলিতে পুঁথিগত বিদ্যা। কলিকালে জন্ম, আচার এবং গুণের মাপকাঠি পয়সা! পয়সা থাকিলেই তিনি উত্তম কুল এবং সকল গুণের গুণমণি। পিতামাতার আর চিন্তা নাই, কারণ কুল-গোত্রাদি বিচার বা ঢাকঢোল বাজাইয়া বিবাহ দিবার আর কোন আবশ্যক হইবে না এবং সমস্ত ব্যবহারিক কার্য্যে লেন-দেন, কেনা-বেচা, আদান-প্রদান, খাওয়া-খাওয়ানোর ভিতর আসিবে মিথ্যা আর জোচ্চুরি। স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা বা প্রীতির কারণ হইবে রতি-কৌশল, সাজ-সরঞ্জাম এবং দৈহিক বল ও বাহ্য সৌন্দর্য্য। গৃহস্থাশ্রম বলিয়া যে একটা কথা তাহা গল্পে পরিণত হইয়া স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ, স্বেচ্ছাচার এবং যথেচ্ছাচারে পরিণত হইবে। দুই পয়সার পৈতা কিনিয়া গলায় দিলেই দ্বিজত্বের পরিচয় হইবে। ব্রাহ্মণের গুণ, ক্ষত্রিয়ের গুণ বা বৈশ্যের গুণ আর দেখাশুনার প্রয়োজন হইবে না, কেবল পৈতা হইলেই চলিবে। লাল কাপড় আর লাঠি হাতে থাকিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যাইবে, আর সাদা কাপড় বা কোট-প্যাণ্ট পরিলেই গৃহস্থ হওয়া যাইবে। আর বিশেষ কিছু দরকার হইবে না। টাকা-কড়ি কম থাকিলে আর ন্যায় পাওয়া যাইবে না। ন্যায়ালয়ে ন্যায় পাইতে হইলে প্রথমেই ষ্ট্যাম্প খরচ আর উকিলের ফি না দিতে পারিলে ন্যায়ালয়ে প্রবেশই নিষেধ। তারপর তদ্বির করা অন্য কথা। ইংরাজীতে এই প্রকার ন্যায় লাভের খরচাকে "To push good money after bad money" বলে। গলাবাজি করিয়া ২।৪ ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারিলেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় হইবে। আর গরীব হইলেই অসাধু, চোর; যে যত দম্ভ করিতে পারিবে সে তত বড় সাধু হইবে। বহুদূরস্থিত হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিলে মহাপুণ্য, কিন্তু কোন শহরের বা লোকালয়ের গঙ্গাজলে সেই পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিবে না। এলাহাবাদে কুম্ভ-মেলায় গঙ্গাস্নান করিতে ৪০ লক্ষ লোক একত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা শ্রীল নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পড়িয়া

আসে নাই—"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম সকলই মনের ভ্রম।" মাথায় বড় বড় চুল রাখিতে পারিলেই লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। আজকাল ছেলেদের মাথায় খুব বড় বড় চুল দেখা যায়। তাদের না খাইয়া না খাইয়া যতই মুখ শুকাইয়া যাক্ না কেন, মাথার চুল বজায় রাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিবেই। অলঙ্কার বলিতে সাবান এবং হিমানী। কলিকালের মন্দ ভাগ্য, দরিদ্র লোকগুলি সাবান মাখিয়া চক্‌চকে হইতে চায় এবং মুখে পাউডার দিয়া অলঙ্কৃত হইতে চায়। ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষ যে চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ আছে, তাহা পেট ভরিয়া দুটি খাইতে পাইলেই সমাধান হইবে। আর বেশী কিছু দরকার নাই। আর মহারাজ দক্ষ যেমন যজ্ঞাদি কার্য্যের দ্বারা দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই দক্ষতা কলিকালের লোক যদি স্ত্রী-পুত্রাদিগকে খাইতে দিতে পারে তা' হইলেই লাভ হইবে। আর যাগযজ্ঞ করিবার কোনও উপায় থাকিবে না। ধর্ম, সেবা নামকাবাস্তে এ-কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমাকে লোকে "ধার্মিক বলিবে, আমার একটা নামজাদা গুরু আছে" ইত্যাদি লোভের দ্বারা বশবর্তী হইয়াই লোকে তথাকথিত ধর্মাচরণ করিবে। মূলে কিছু হোক্ বা নাই হোক্, এই ভাবের লোকগুলি সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িলে তাদের মধ্যে যে বলীয়ান্ হইবে সেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে 'লীডার' বা 'নেতা' সাজিয়া মন্দ-ভাগ্য সুমন্দমতি মূর্খ লোকগুলিকে ভোগা দিয়া ভোট সংগ্রহ করিয়া রাজ-গদীতে বসিয়া পড়িবে। বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়া পড়িবার মত, সেই ব্যক্তি রাজগদীতে বসিলে কি হইবে? "শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্।" যার যে স্বভাব সে কি কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে? কুকুরকে ঠাকুরের গদীতে বসাইলে কি হইবে? তার যে স্বভাব শুষ্ক চর্ম্ম সেবন, তাহা সে ছাড়িবে না। সেই প্রকার ভোটরঙ্গে সিদ্ধ রাজ-পুরুষগণ তাহাদের স্বভাবগত কার্য্যগুলি নিশ্চয়ই করিবে। সে প্রজা পালনের কি শাস্ত্র পড়িয়াছে যে, লোকের জন্য তার বুক ফাটিয়া যাইবে? বুক ফাটিবে লেক্‌চার দিবার সময় কিন্তু কাজের বেলায় কেবল লুট! 'অন্ধের নগরী, বেকুব রাজা। টাকে সের ভাজি, টাকে সের খাজা॥' যেমন প্রজা তেমন রাজা এই ভাবে কলিকালের বেশ একটি ছবি আঁকা আছে; তাহা দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন "বর্ণাশ্র মধর্ম্ম, ইহ বাহ্য আগে কহ আর" কলিকালের লোক কি বর্ণাশ্রম ধর্ম আচরণ করিবে? তাহাদের ত সবকিছুই উলট পালট হইয়া গিয়াছে।

স্বয়ং ভগবান ভগবদগীতায় বলিয়াছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ।" (গীঃ ৪/১৩) সুতরাং তাঁর গঠিত কোন জিনিষ ভাঙ্গিবার উপায় নাই। কলিকালের চারিটি বর্ণও গুণ এবং কর্ম্মানুসারে চলিতেছে, কিন্তু তাহার রং পাণ্টাইয়াছে। যেভাবে রং পাণ্টাইয়াছে তাহা আমরা আমাদের ইংরাজী গ্রন্থ 'SCIENCE OF DEVOTION'এ নিম্নলিখিত ভাষায় অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যথা—

"The system of 'VARNASHRAM DHARMA' as it is made in the scriptures and which aims at achieving the favour of Vishnu is undoubtedly the solution of the problems of birth and death. At present the jeopardised system of 'VARNASHRAM DHARMA' has produced a perverted form of Varna or class of people and they are now represented by the political deplomats, the soldiers, the capitalists and the general mass of skilled and non-skilled labourers. The politicians or the best planning brains of human being, have taken the position of the Brahmins. Formerly the Brahmins possessed the best brain for solution of the problems of human life and the present politicians are making use of the best part of brain for executing the plan of their own which shall bring in only disaster on the society. The military arrangement is the perverted representation of Kshatryas and as such the military department of every state, instead of giving any actual protection to the people—is sucking the very blood of the mass of people by imposing heavy and unbearable taxes for its maintenances.

The capitalists, who are represented as the perverted Vaishyas instead of accumulating wealth for executing the will of Vishnu,—are amassing huge amount of wealth for their own sense-gratification. As a result of this, many problems in the shape of political creeds have sprung up in all parts of the globe. And so also the labour problem is the perverted representation of the 'Sudras' who are now

serving the capitalists under pressure of many obligations and groaning to make an adjustment of the labour problem by many political issues.

So the system of 'VARNASHRAM' is not altogether ostracised as some wants to have it done, but the whole thing has now been pervertedly represented...........the whole thing being thus complicated by the law breaking attitude of the human being, a peaceful atmosphere of progressive human life, has deliberately been jeopardised. As such, the present system of fossilized' 'VARNASHRAM DHARMA' cannot in any way please the All pervading Godhead Vishnu and therefore nobody can escape from the police action of the material Nature—however we may be expert in the manipulation of material science.

* * * *

Thus when the question of 'VARNASHRAM DHARMA' was raised by Sri Ramananda Rai. Sri Chaitanya Mahaprabhu at once rejected the issue by saying that it has no value in the matter of pure devotional service.

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ' অর্থাৎ করুণা করিয়া কলিতে অবতীর্ণ হইয়া যে অপূর্ব্ব বস্তু দান করিয়াছেন তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে আচরণ করিলেও বহুদূরে থাকিবে। এ বিষয়ে আমাদের দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথম লক্ষ্য এই যে কলিকালে ভাঙ্গাচুরা রাক্ষস বা অদৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়াও কোন লাভ নাই এবং সেই খণ্ড বিখণ্ড বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে পুনর্গঠিত করিয়াও বিশেষ সুবিধা নাই। সুতরাং অদৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দিকে বিশেষ আগ্রহ করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার কোনই আশা নাই। দ্বিতীয় লক্ষ্য এই যে—বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালন করা যায় তাহাতেও কোন লাভ নাই ; কারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া যে বহিরঙ্গ অস্মিতা দ্বারা বিষ্ণুপাদপদ্ম লক্ষ্য করা হয়, তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেয় বস্তু হইতে বহুদূরে জানিতে হইবে। শ্রীল রূপগোস্বামী সে কথা বুঝিয়াই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মহাবদান্য অবতার কৃষ্ণপ্রেমদাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলে

ক্রমশঃ সাধুসঙ্গ প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম পাইবার উপায়-স্বরূপ হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-প্রেম পাইবার যে উপায় তাহা সুষ্ঠু আলোচনা করিবার জন্যই শ্রীরামানন্দ রায়কে প্রভু সাধ্য-সাধন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের যাহা ধারণা, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার, তদ্দ্বারা যে কৃষ্ণপ্রেম বহুদূরে সেইগুলি ক্রমপন্থাদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া সর্বোত্তম অপ্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল রামানন্দ রায়ের এই সমস্ত প্রসঙ্গের আলোচনা। কলিযুগের জীব যেমন নিম্নস্তরে পতিত তেমনই দয়া করিবার জন্য মহাবদান্য অবতারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সেই পতিত জীব-সমূহকে সর্বোচ্চ দান দিবার জন্য আসিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই বদান্যতার সুবিধা যাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না তাহারা নিশ্চয়ই চিরবঞ্চিত হইয়া থাকিবে একথা মহাজনগণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ॥"

"আমি বঞ্চিত হইলাম, বঞ্চিত হইলাম, নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হইলাম। সমগ্র বিশ্ব শ্রীগৌরপ্রেমে মগ্ন হইল, হায় আমার ভাগ্যে স্পর্শ মাত্র ঘটিল না।"

সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিতে পারে এমন একটি অপ্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্ম অথচ সর্বোচ্চ 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' দান এইভাবের যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আমরা নিজেরা বুঝিতে না পারি বা নিজেরা বুঝিয়া জগতের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা বঞ্চিত হইলাম। একথা দৃঢ়তার সহিত বুঝাইবার জন্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তিনবার 'বঞ্চিত' কথাটি প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথাটি 'নিজে গ্রহণ করা' এবং 'অপরকে গ্রহণ করাইবার চেষ্টা'—দুইটি কার্য্য একই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জানাইয়াছেন—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি-সর্ব্ব-গুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪/১০২-১০৩)

সুতরাং 'আচার' ও 'প্রচার' একই যুগপৎ অনুশীলনীয়। যাঁরা বলেন যে, "প্রথমে নিজে পাকা হই, তারপর প্রচার করিব, তাঁদের বিচার সুষ্ঠু নহে। কারণ প্রচারই কীর্ত্তন। কীর্ত্তন ব্যতীত কোনও সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং প্রচারের দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের শুদ্ধিতা হয়।" শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়েছেন—এবং মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই প্রকার বিচারই শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসাধারণকে হুকুম দিয়াছেন যে, তাঁর আজ্ঞা বহন করিয়া সর্ব্বত্র সকলেই 'গুরু-র'কার্য্য করুন এবং সেই আজ্ঞাটি কি তাহাও তিনি বলিয়াছেন,—

> যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
>
> [চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮]

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর প্রভুপাদ যদি তাঁর অনুকম্পিত প্রচারকগণকে প্রথমে পাকা করিয়া তারপর পরোপকার করিবার জন্য পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁর প্রচার-পদ্ধতি অন্যপ্রকার দেখিতাম। তিনি স্বয়ং গৌর-শক্তির মহিমা প্রকট করিবার জন্য যে কোন সাধারণ ব্যক্তিকে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহারা সাধারণভাবে মায়িক জগতে অতি নিম্নস্তরের কার্য্য করিবার যোগ্য, এমন লোককেও তিনি শক্তি সঞ্চার করিয়া হরিকীর্ত্তনরূপ প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছেন। 'মূকং করোতি বাচালং' এ-কথার পরিচয় আমরা সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, প্রচারকার্য্যে যে-কথা লোকের কাছে বিতরণ করিতে হইবে সেকথা যদি খাঁটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা হয়, তাহা হইলেই মূককেও বাচাল করিয়া তোলে। কিন্তু তখনই আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় হয়, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত কথাগুলির ভিতর নিজের খানিকটা কথা গোঁজামিল দিয়া থাকি। এই গোঁজামিল কার্য্যটিই আমাদের সর্বনাশের কারণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমন কোন দুরূহ কথা বলিতে আসেন নাই, যাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণ করিবার অসুবিধা আছে। তাঁহার কথা যদি সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার মত না হইত, তাহা হইলে জগৎপ্লাবন কথাটির কোন সার্থকতা নাই। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান্ এবং তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, কলিকালের পতিত জীব কিভাবে তাঁর এত বড় উচ্চস্তরের কথা গ্রহণ করিতে পারে; সুতরাং তাঁর কথা

নিশ্চয়ই সকলের বোধগম্য। কিন্তু আমাদের একপ্রকার দুর্ভাগ্য যে তাঁর কথা আমরা গ্রহণ করি না। দ্বিতীয় প্রকার দুর্ভাগ্য এই যে, নিজের কিছু বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তাঁর কথার ভিতর কিছু গোঁজামিল দিয়া থাকি। সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজার দল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথার ভিতর গোঁজামিল দিয়াই প্রাকৃত জাড্য-ধর্মের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ায় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের গোঁজামিল ধর্ম্মটি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে, এই কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন। "সুতরাং এই গোঁজামিল কার্য্যটি বাদ দিয়া সরলভাবে যদি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা জগতে বিতরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে সেপ্রকার চেষ্টাই আমাদের একমাত্র ভজন। খুব বেশী পাকা সাজিতে গেলে প্রচার-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া পাকা হইবার পরিবর্ত্তে কাঁচা অবস্থাতেই জীবন কাটিয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'নিছক সত্য কথাটি' যদি আমরা একান্ত অপারগ হইয়া ভারবাহী গর্দ্দভের মতও বহন করিয়া লইয়া যাই তাহাতেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন।" অবশ্য যদি তাহাতে আমাদের স্বকপোলকল্পিত কিছু ভেজাল না দেই, যদি তাঁহার আদেশের সামান্য একটুও পালন করিতে পারিয়া তাঁরই করুণা-কটাক্ষমাত্র লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের অনেক উপরের বস্তু আমরা প্রাপ্ত হইব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "মহাবদান্য অবতারের করুণার দান বলিলে—ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অত্যন্ত অল্প শক্তির দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্বস্তু লাভ।"

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারপরায়ণ চিজ্জড়সমন্বয়বাদীকে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অসারতা বুঝাইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে 'আগে কহ আর,' বলিলে, শ্রীরামানন্দ রায় মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই আর একটু উচ্চস্তরের কথা—'ভগবানকে কর্ম্মার্পণের কথা' বলিলেন। কিন্তু সেই প্রকার কর্ম্মার্পণ কার্য্যটিও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার উপায় নহে, তাহাও মহাপ্রভু বুঝাইবার জন্য 'ইহ বাহ্য আগে কহ আর' বলিলেন।

ভগবানকে কর্ম্মার্পণ পদ্ধতির দ্বারা নির্ব্বিশেষ বিষ্ণু-প্রতীতি ছাড়াইয়া ভগবানের বিশেষত্ব উপলব্ধি হইলেও, উহা প্রেমার্থ লাভ করিবার উপায় হইতে অনেক দূরে। ভগবান গ্রহণ করিবেন এই পর্য্যন্ত ধারণা হইতে পারে, কিন্তু যিনি দিবেন তিনি ভগবৎ-প্রেমদ্বারা প্রণোদিত না হওয়ায় বাস্তবিক তিনি

কর্ম্মার্পণ করিতে অক্ষম হইবেন। আমার পরিশ্রমার্জ্জিত বিত্ত আমি ভগবান্‌কে দিব, ইহা ভগবৎ-প্রেম ব্যতীত সম্ভব হয় না। কিন্তু এই প্রকার কর্ম্মার্পণ আমার দ্বারা সাধকের কানে একটা ঝঙ্কার মাত্র বাজে যে, ভগবান্‌কে দিলে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন এবং যখন গ্রহণ করিতে পারেন, খাইতে পারেন, আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষ নহেন। এই [illegible] নির্বিশেষবাদের হাত হইতে সবিশেষবাদে পৌঁছিবার একটা জ্ঞান আনয়ন করিলেও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-তত্ত্বের সন্ধান দিতে চান, তাহা হইতে এই জড় উপলব্ধির সবিশেষবাদ বহুদূরে। সুতরাং এই প্রকার কর্ম্মার্পণ দ্বারাও ভগবৎ-প্রেম পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া ইহাও মহাপ্রভু বাহ্য বলিয়া আরও অগ্রসর হইবার জন্য শ্রীরামানন্দ রায়কে অনুরোধ করিলেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিপরীত উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিতে জীবনাতিপাত করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানকে দিতে হইবে, এই কথা কেহই স্বীকার করিবে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁহার অর্জ্জিত ধনরাশি হইতে অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দান করিয়াছিলেন। ভগবানের পক্ষ হইতে ভগবৎ-সেবক ভগবদ্ভক্তই সমস্ত গ্রহণ করিতে পারেন এবং শাস্ত্রে সেইজন্য ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবার কথা পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। কিন্তু বর্ণাশ্রমের বাহিরে ম্লেচ্ছ-যবনাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দান করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন বা তাঁহাদের সেবার মধ্য দিয়াই ভগবান্ হাত পাতিয়া সমস্ত জিনিষ গ্রহণ করেন, একথা উচ্ছৃঙ্খলবাদী আধুনিক সভ্য সমাজ আর গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাহারা এখন ভগবানকে দরিদ্ররূপে দর্শন করিতে শিখিয়াছে। "নির্বিশেষবাদীদের চরম অধঃপতন নিজে ভগবান সবাই ভগবান এবং শেষ পর্য্যন্ত দরিদ্র-ভগবান বা 'দরিদ্র-নারায়ণ'।" তাহারা নিজে সর্ব্বস্ব খাইয়া ভগবান্ খাইতেছেন,— এই কথা প্রকাশ করিবার জন্য ভগবদ্গীতার এই শ্লোক উদ্ধার করেন। যথা—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥

(গীঃ ১৫/১৪)

"আমি জঠরানলরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চতুর্ব্বিধ অন্ন জীর্ণ করিয়া থাকি।" সুতরাং তাহাদের পেটের ভিতর যখন ভগবান বসিয়া আছেন, তখন আর অন্যত্র ভগবানকে খাইতে

দিবার কি দরকার? বিশেষ করিয়া কাঠ-পাথরের ভগবানের খাইবার কি শক্তি আছে? এইসমস্ত আসুরিক বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া বহু প্রাচীন মন্দিরের রাজসেবা-সকল ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া দিতেছে। এমন কি শুনা যায়, শ্রীধাম পুরী ক্ষেত্রেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার পরিপাটির অনেক হ্রাস করা হইয়াছে। এবম্প্রকার নাস্তিক জগৎ ভগবানের হাতে সব সমর্পণ করিবে, ইহা বাতুলতা মাত্র; অতএব শ্রীগৌরসুন্দর এই বিধিটিও 'বাহ্য' বলিলেন।

তাহার পরের কথা—কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্ম—সন্ন্যাস; সে কথাও শ্রীরামানন্দ রায় উল্লেখ করিলেন। কিন্তু কলিকালের সন্ন্যাস—সে একটা বেশ-গ্রহণ মাত্র। ইহাতে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অনাশ্রিত কর্ম্মফল হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। কিন্তু অবিশুদ্ধ চিত্ত লইয়া যে-সন্ন্যাস গ্রহণ, তাহাতে ভোগের পিপাসা পরিপূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকায়, ইহাও কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির উপায় নহে। আর কর্ম্মসন্ন্যাস একে ত' সকলের পক্ষে কলিকালে সম্ভব নহে, দ্বিতীয়তঃ যদিও কাহারও সম্ভব হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা একটি কর্ম্মোন্নত জীবন হইলেও ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা মাত্র, তদ্দ্বারা ভগবৎপ্রেম লাভ হইতে পারে না। তাহার কারণ, ত্রিগুণের সাম্য অবস্থা বিরজা নদী, সেখানে ত্রিগুণের প্রাবল্য লক্ষিত না হইলেও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য তথায় নাই। ভগবদ্ভক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার অধীনে সম্ভব হয়। 'মহাত্মানস্তু' দৈবী-প্রকৃতির আশ্রিত। মহামায়া হইতে উদ্ধার পাইয়াও যোগমায়ার আশ্রয় ব্যতীত বৈকুণ্ঠ-সংবাদ পাওয়া অসম্ভব। শ্রীগৌরসুন্দর মুখ্যভাবে বৈকুণ্ঠ-সংবাদ দিবার জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠ জগতের সর্ব্বোপরি যে গোলোক-বৃন্দাবন, সেই অসমোর্দ্ধ জগতের ভাবসমুদ্র শুদ্ধ ঐশ্বর্য্যশিথিল অপ্রাকৃত সাহজিক ভগবৎ-প্রেম দান করিবার জন্য আসিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধ বা অশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসীগণ সেই অসমোর্দ্ধ কথা কি বুঝিবে? সেই সকল সন্ন্যাসীর কৃষ্ণতত্ত্ব-রস গ্রহণের যোগ্যতার অভাব বুঝিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ঐপ্রকার সন্ন্যাস-গ্রহণও বাহ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন শ্রীরামানন্দ রায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিলেন।

'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' হইলে ভগবদ্ভক্তির পথ দেখা যায় বটে, কিন্তু মাঝপথে নির্ব্বিশেষ সাযুজ্য মুক্তিই চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। ভগবদ্ভক্ত সাযুজ্য মুক্তিকে

নরক-তুল্য জ্ঞান করেন এবং ভগবান্ সারূপ্য, সালোক্যাদি তাঁহাদের দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, শুদ্ধভক্ত ভগবানের প্রেমসেবা ছাড়া কোনপ্রকার মুক্তি গ্রহণ করেন না। সুতরাং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে সেই শুদ্ধপ্রেম লাভ করিবার আশা নাই। ঐপ্রকার অস্মিতাদ্বারা নিরস্ত-কুহক বাস্তব-সত্য বস্তুর বিশেষ উপলব্ধি হয় না বলিয়া উহাও বহির্ম্মুখিনী বৃত্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেয় নিত্যশুদ্ধ জীবের নিত্যকালীন সেব্যবস্তু। উহা কাল্পনিক বিচার প্রণোদিত কোন মনোধর্ম নহে, আত্মার স্বরূপ-বৃত্তি, এবং তাহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সোজাসুজি দিবার জন্য 'করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ' বাক্যরূপে আসিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ রায় পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভক্তিপথের অপ্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্ম সকলের পক্ষে সম্ভব এবং আবালবৃদ্ধ-বনিতা, পণ্ডিত, নীচ, মূর্খ্য, যবন, কিরাত-হূনান্ধ্র, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, হিন্দু-মুসলমান, দেশী-বিদেশী যে যেখানে যত প্রকার মনুষ্য-সমাজ ও পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গাদি জীবজাতি আছে, সেইসকল জীবের জন্যই একমাত্র সার্ব্বজনীন বিধি 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি'র কথা অবতারণা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাহাই প্রথমে 'ইহ হয়' ব'লয়া স্বীকার করিলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় জ্ঞানশূন্যা ভক্তি লাভ করিবার বিধি—ব্রহ্মা গোবৎস-হরণাদি করিবার পর যে কৃষ্ণ-স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধার করিলেন—

> জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
> জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
> স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
> র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
> (ভাঃ ১০।১৪।৩)

"হে ভগবান্, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধু-মুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে অবস্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া থাকেন।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেয় 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' বাক্যের উদ্দিষ্ট কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার ইহাই প্রথম ও শেষ কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়ের মুখারবিন্দ হইতে এই কথা শ্রবণ করা মাত্রই 'ইহ হয়, আগে কহ আর' বলিয়া এই পদ্ধতি স্বীকার করিলেন। ইহার পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা

আলোচনা করা হইয়াছে তাহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কথা, ভগবানে কর্ম্মার্পণ করার কথা বা নিষ্কাম কর্মযোগের কথা, সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসের কথা এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা। সমস্ত জগৎ এই কথাগুলিরই নানা প্রকার 'হের-ফের' করিয়া বহু কথারই আবিষ্কার করিয়াছে ; কিন্তু সেই সমস্ত কথাই যে 'প্রেমা পুমর্থো মহান্' বা পঞ্চম পুরুষার্থ দিতে অসমর্থ, তাহা প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ-প্রেমা লাভ করিবার সবচেয়ে বড় শত্রু নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান—

> "তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
> যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
> (চৈঃ চঃ আঃ ১/৯২)

যাহাদের হৃদয়ে মোক্ষবাঞ্ছা লুক্কায়িত, তাহারা যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বুঝিবার চেষ্টা না করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ভাগবত ধর্ম্ম। 'শ্রীমদ্ভাগবতে' এই মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রকৃষ্টরূপে নিরস্ত করা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তি স্বয়ং ক্লেশঘ্নী এবং তাপত্রয়-উন্মূলনী। যাহারা ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মোক্ষ বাঞ্ছা করেন, তাহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিলে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'হরের্নাম মন্ত্রে' দীক্ষিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন বৈজয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত ও ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। এইখানেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণার পরিচয়। যে চিত্ত শুদ্ধ করিবার জন্য বহুপ্রকার যজ্ঞ, দান, তপস্যা করিতে হয়, তাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় অপরাধশূন্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রথম ফল। আর যে জড়মুক্তির জন্য জ্ঞানীসম্প্রদায় জন্ম-জন্মান্তর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকেন সেই ত্রিতাপ বা ত্রিগুণময়ী জড়মুক্তি দ্বিতীয় ফল। জড়মুক্তির পর পরমশ্রেয় ভগবদ্ভক্তির বিকাশ এবং বিদ্যাবধূর জীবন, আনন্দ-সমুদ্রের বর্দ্ধন, আত্মার সর্ব্বতো মঙ্গলসাধন ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে আরও যে সমস্ত ফল আছে, তাহার সন্ধান নির্ভেদ জ্ঞানানুসন্ধিৎসুর জানিবার উপায় নাই। সুতরাং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানচেষ্টা প্রথমেই ত্যাগ করা উচিত।

এই নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান কার্য্যটি একটি কৃত্রিম অপচেষ্টা মাত্র। স্বাভাবিক-ভাবে প্রত্যেক মনুষ্যই ভগবানের অসমোর্দ্ধতা স্বীকার করে। কেহ বা নিম্নস্তরে তাঁহার শক্তিকে বহুমানন করে, কেহ বা উচ্চস্তরে ভগবান্‌কেই সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করে। দুর্ভাগ্যক্রমে অসৎ কৃষ্ণাভক্ত মায়াবাদীর

পাল্লায় পড়িয়া লোক ক্রমশঃ এই নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-কার্য্যে ব্রতী হয়। মায়ার শেষ জাল এই নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান-প্রয়াস। নিজ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে যাইয়া মনুষ্যজাতি এইভাবে 'মায়য়াপহৃতজ্ঞানঃ' হইয়া যায়। নচেৎ সাধারণভাবে সকলেই ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করে এবং তিনি যে অসমোর্দ্ধ, তাহা স্বীকার করে। সুতরাং মায়াবাদীর সঙ্গবিবর্জিত সাধারণ লোক সকলেই মহাপ্রভুর কথা শুনিবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু এমনই কলির প্রভাব যে, এই সর্ব্বনাশী মায়াবাদ বহুপ্রকার জাল বিস্তার করিয়া নিরীহ সাধারণ লোককে আক্রমণ করিতেছে। "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁদের কর্তব্য হইতেছে এইসকল নিরীহ ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণোপদেশ দিয়া মায়াবাদের হাত হইতে রক্ষা করা। অপসম্প্রদায় ভগবদ্বিদ্বেষিগণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে ভাগবত-সম্প্রদায়ের দৃঢ়তার সহিত প্রচার করা আবশ্যক।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব, সাধুমুখে ভগবৎকীর্ত্তন শ্রবণ করা। শ্রবণ করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ, দেশী-বিদেশী, স্বধর্মী-বিধর্মী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেরই শ্রবণাধিকার আছে। ইহাতে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী কোন গুণেরই অপেক্ষা নাই। সাধুমুখ হইতে হরিকীর্ত্তন বা কৃষ্ণকীর্ত্তন সকলেই করিতে পারেন। একমাত্র শ্রবণের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উভয়েই ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধু-মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ এবং নম্রভাবে জীবন-যাপন সকলেই করিতে পারেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিলে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন ; কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কীর্ত্তন সমস্তই বুঝায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'ভগবদ্গীতা' কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি 'ভগবদ্গীতা' সূর্য্যকে বলিয়াছিলেন, সূর্য্য মনুকে বলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেন এবং এই প্রকার শিষ্য-প্রশিষ্য সম্প্রদায়ে ভগবদ্গীতা যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হইয়াছিলেন। পরম্পরা ব্যতীত ভগবদ্গীতার রহস্যভেদ করিবার উপায় নাই। মায়াবাদীর 'কচকচানি' 'ভগবদগীতার' রহস্যভেদ করিতে সক্ষম নহে। ভগবদ্ভক্ত যে-ভাবে 'ভগবদগীতা' ব্যাখ্যা করেন, তাহাই শ্রবণীয়। 'মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।' ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুন মহাশয় হইতে পুনরায় পরম্পরা আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন ভগবানকে শাশ্বত পুরুষ, অজ, অব্যয়, পরংব্রহ্ম, পরমধাম, বিভু ইত্যাদি বলিয়া স্বীকার

করিলেন। তাঁহার কথা অন্যান্য ঋষি, দেবর্ষি নারদ, ব্যাস, দেবল, অসিত প্রভৃতি বড় বড় মহাজনের কথার সঙ্গে মিল রহিল এবং ভগবানও তাঁহার অসমোর্দ্ধ ভগবদ্ব্যক্তিত্বের কথা "ভগবদগীতায়" ব্যক্ত করিলেন। এসকল সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া মায়াবাদীর ভাষ্য নির্ব্বিশেষবাদ, অহংগ্রহোপাসনা ইত্যাদি শ্রবণ করিলে অন্ধতম নরকে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তের পক্ষে কৈবল্য-সুখ পর্য্যন্ত অন্ধতম নরক।

শ্রীমদ্ভাগবত-ভগবানের এবং ভগবদ্ভক্তের নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তনাখ্য অমল পুরাণ। তাহাও পরম্পরাসূত্রে শ্রবণ করা উচিত। 'যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১)। ভক্ত-ভাগবত বিনা গ্রন্থ-ভাগবত কেহই ব্যাখ্যা করিতে পারে না, এবং ভক্ত-ভাগবত ভাগবত-ব্যাখ্যার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না। সাধুশব্দেও ভক্ত-ভাগবত। যিনি অনন্যভাবে ভগবদ্ভজন করেন. তিনিই সাধু। তাঁহার মুখে ভগবানের বীর্য্যবতী কথা শ্রবণ করিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিলেই অজিত ভগবান্ জিত হইয়া যান। সাধু-মুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী ভগবদ্বাণী জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইলে নিজেকে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সকল মনুষ্যেরই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকার আছে। এবং ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত যে-কোন ব্যক্তির 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়' বিচারানুসারে কৃষ্ণানুকীর্ত্তন করিবার অধিকার আছে। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে সত্য, শম, দম, তিতিক্ষা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য এবং শৌচ এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হইতে হয়। ছল, চাতুরী, মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি, দুর্ব্বাসনা ইত্যাদি কার্য্য হইতে দূরে থাকিয়া ভজনবিজ্ঞ সাধুর নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করতঃ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান-প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যাঁহারা জীবন-যাপন করিবেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাবলে ভগবৎ-প্রেমরূপ পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভের অধিকারী। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'করুণয়া অবতীর্ণঃ কলৌ'—বাক্যের সার্থকতা-স্বরূপ করুণাবতারের মহাবদান্য-দান।

জটিল সমস্যা

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

অভিজ্ঞজনের কথা না শুনিয়া যে-সকল ব্যক্তি সার্বজনীন মঙ্গলের পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের এই কফ-পিত্ত-বায়ু-সম্বলিত হাড়-মাংসের থলীবিশেষ জড়শরীরে আত্মবুদ্ধি হয়। জড়শরীরকে আত্মবুদ্ধি করিলেই শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধিত স্ত্রী-পুত্র, দেহ-গেহ এবং দেহের জন্মভূমি স্বদেশ-প্রেম জাগরিত হয়। স্বদেশ-প্রেম জাগরিত হইলে লোকের দেহাত্ম-বুদ্ধি অধিকতর প্রসারিত হইয়া মাটিতে পূজ্যবুদ্ধি উদিত হয়। এই মাটিতে পূজ্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকগুলি দোলো হইয়া একযোগে পরস্পরের সর্বনাশ করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

'দেহাত্ম-বুদ্ধি' হইতে যে দেশাত্মবুদ্ধি উত্থিত হয়, এবং তদ্দ্বারা জগতের লোকের যে কি অসুবিধা হয়, তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি। পৃথিবীস্থ দোলো লোকের মধ্যে এখন, 'রাশিয়া দোলো' এবং 'আমেরিকা দোলো' এই দুইটি দোলোই খুব পরাক্রান্ত মেটেবুদ্ধির লোক। এই দুইটি দোলো লোকের মধ্যে আজ প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ বহুপ্রকার স্নায়ুযুদ্ধ বা 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ' চলিতেছে অর্থাৎ ভবিষ্যতে পরস্পর যুদ্ধ করিবে এই আশায় গোলা-বারুদের পরিণাম-স্বরূপ 'গরম-যুদ্ধ' আরম্ভ করিবার পূর্বেই আণবিক খোরাক প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার জন্য উভয়েই খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এইপ্রকার আণবিক আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্করণের জন্য পরস্পরের যে শক্তি ক্ষয় হইতেছে, তাহাই 'স্নায়ুযুদ্ধ' বলিয়া জগতে প্রচারিত। এই দুই দলের গরম যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই দেশাত্মবুদ্ধির চরমাবস্থা যে ধ্বংস, তাহার পরিচয় আমরা কিছু কিছু পাইতেছি।

গরম যুদ্ধ কিভাবে করিতে হইবে, তাহার এখন 'রিহার্সাল' বা আখড়া চলিতেছে। রাশিয়া ও আমেরিকা তাহাদের আণবিক আগ্নেয়াস্ত্রগুলির ধ্বংস-শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বা সমুদ্রে এই

সকল আণবিক আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বিস্ফোরণ করিতেছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর মধ্যে প্রায় ৬৬ টি আণবিক বিস্ফোরণ সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমেরিকা একাই প্রায় ৫১ টি বিস্ফোরণ করিয়াছেন। রাশিয়া করিয়াছেন ১২ টি এবং ইংরাজ করিয়াছেন ৩ টি বিস্ফোরণ। এইসকল বিস্ফোরণের ফলে জগতের যে অহিত বা অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা ভগবদ্গীতায় এইপ্রকার অহিত ও অমঙ্গলের কথাও উল্লেখ দেখিতে পাই—

'অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
(গীঃ ১৬।৮-৯)

আসুরিক প্রবৃত্তির লোকগুলি দেহাত্ম-বুদ্ধিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যকে অবহেলা করিয়া তাহাতে মেটো অল্পবুদ্ধির পরিচয়-স্বরূপ যে-সকল উগ্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং তাহাতে জগতের যে সমূহ অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। প্রফেসর জোসেফ রোবাণ্ট নামক জনৈক অভিজ্ঞ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগতের লোককে এইভাবে সাবধান করিতেছেন, যথা—'It is no longer a question of two nations or groups of nations devastating each other, but of all the future generations who will for ever pay through disease, mal formation and mental disability for our folly."

অর্থাৎ, দোলো লোকের এইভাবে রেষারেষি এখন আর মাত্র দুইটি জাতির মধ্যে বা দুইটি সঙ্ঘের মধ্যে আবদ্ধ নহে। "এই রেষারেষির ফলে ভবিষ্যতে সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে রোগ-শোকাদির প্রায়শ্চিত্তরূপ যে আত্মবলিদান দিতে হইবে, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ।" আণবিক বিস্ফোরণের ফল-স্বরূপ সমস্ত পৃথিবীর লোক দগ্ধ হইয়া বহুপ্রকার রোগে ত' নিশ্চয়ই আক্রান্ত হইবে, উপরন্তু তাহারা সকলে খর্বাকার বামন হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মস্তিষ্ক প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং "উপস্থিত আমরা যে আণবিক অস্ত্রের বাহাদুরি দেখাইব তাহার ফল ভোগ করিবে—আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীগণ।"

এই আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ এবং আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ প্রায় একরকম। 'শ্রীমদ্ভাগবতে' আমরা অশ্বত্থামা-কর্তৃক এই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ পাই, যথা—

"ততঃ পাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্ব্বতো দিশম্।" অর্জ্জুন-কর্তৃক প্রধাবিত হইয়া প্রাণভয়ে "অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো মেনে আত্মত্রাণাং দ্বিজাত্মজঃ" অদূরদর্শী ব্রাহ্মণপুত্র (ব্রাহ্মণ নহে) অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্রকেই আপনার উদ্ধারের উপায় মনে করিয়া উহা প্রয়োগ করিলেন, যদিও তিনি সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রত্যাহার মন্ত্র জানিতেন না। ফলে সেই ব্রহ্মাস্ত্রের অগ্নিতেজ সর্বত্র প্রসারিত হইয়া দারুণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। আণবিক বিস্ফোরণের ফলস্বরূপ যেমন Radiation বৃদ্ধি করিয়া দেয়, সেইভাবে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাও সমস্ত পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি হইয়া যায়। হঠাৎ তাপবৃদ্ধি-জনিত চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিমিদং স্বিৎকুতো বেতি দেবদেব ন বেদ্ম্যহম্।
সর্বতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণম্॥
(ভাঃ ১।৭।২৬)

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! এইরূপ অসহ্য তাপবৃদ্ধি হঠাৎ কিভাবে হইল? এই তাপের তেজ সর্বতোব্যাপী হইয়াছে এবং পরমদারুন রূপ ধারণ করিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন।

বেত্থেদং দ্রোণপুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদর্শিতম্।
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণাবধ উপস্থিতে॥
ন হ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনম্।
জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধমস্ত্রজ্ঞোহ্যস্ত্রতেজসা॥
(ভাঃ ১।৭।২৭-২৮)

এই অগ্নিতেজ যাহা অনুভূত হইতেছে, তাহা দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ জন্য হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝ। সেই দ্রোণপুত্র এই ব্রহ্মাস্ত্র সংহরণ করিতে না জানিয়াও তাহা প্রয়োগ করিয়াছে। নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সে এই অপকার্য্য করিয়াছে। অতএব সেই ব্রহ্মবন্ধু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র কিন্তু ব্রাহ্মণ নহে) এই অদূরদর্শিতার কার্য্য করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কৌশলের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু তুমি সেইপ্রকার অকুশল অস্ত্রজ্ঞ নও। অতএব যেভাবে এই অস্ত্র জয় করিতে হয়, তাহা তুমি জান। তুমি ইহার যথোচিত

ব্যবস্থা কর। এই ব্রহ্মাস্ত্রকে তুমি ক্ষুণ্ণ করিয়া দাও। তুমি ইহা অপেক্ষা উন্নত ব্রহ্মাস্ত্র তেজের দ্বারা এই তেজকে নষ্ট কর। এইভাবে সেই নিম্নাধিকারীর ব্রহ্মাস্ত্রকে হনন করিয়া তুমি তোমার ব্রহ্মাস্ত্রতেজ প্রত্যাহার কর।

শ্রুত্বা ভগবতা প্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
স্পৃষ্ট্বাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মাস্ত্রং সন্দধে॥
সংহত্যান্যোন্যমুভয়োস্তেজসী শরসম্বৃতে।
আবৃত্য রোদসী খঞ্চ ববৃধাতেঽর্কবহ্নিবৎ॥
দৃষ্ট্বাস্ত্রতেজস্তু তয়োস্ত্রীল্লোঁকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ সাম্বর্ত্তকমমংসত॥
(ভাঃ ১।৭।২৯-৩১)

"ফাল্গুনী অর্জ্জুন তখন ভগবানের সেই কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে জল দ্বারা আচমন করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমা করিবার পর দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বৃহৎ অগ্নিবৎ বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত পৃথিবী ও আকাশকে তেজময় করিয়া তুলিল। এরূপ তেজময় হইল যেরূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালীন সঙ্কর্ষণ-মুখোদ্গীর্ণ অগ্নি সূর্য্যকে তেজময় করিয়া থাকে। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই প্রলয়ঙ্কর অগ্নিতেজ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এতদ্দ্বারা সমস্ত ত্রিলোক এবং প্রজাগণ ব্যথিত হইতেছে, অতএব তিনি সেই অগ্নিতেজ হইতে দহ্যমান্ প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য লোকহিতার্থে এবং ভগবান্ বাসুদেবের ইচ্ছানুযায়ী উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ সম্যক্‌রূপে পরিহার করিলেন।

উক্ত শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, আধুনিক আণবিক অস্ত্র সমূহ প্রস্তুত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যে অর্থ ও শক্তিক্ষয় করিতেছেন, তাহা না করিয়া তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিজ্ঞান-মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ভারতের বীরগণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে জানিতেন এবং কেবল প্রয়োগ করিতে জানিতেন না, পরন্তু তাহা সংহরণ করিতেও জানিতেন। অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্রহ্মবন্ধু দ্রোণপুত্রের অস্ত্র প্রয়োগ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিন্দনীয় হইয়াছিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ নিন্দনীয় হয় নাই। তিনি উন্নত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দ্রোণ-পুত্রের অনুন্নত ব্রহ্মাস্ত্রের খণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু

উভয় অস্ত্রের তেজ যখন সমস্ত পৃথিবী ধ্বংসের উপক্রম করিয়াছিল, তখন তিনি উভয় অস্ত্রের তেজ অপহরণ করিয়া দহ্যমান প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবদ্ আদেশ পালন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের পর যিনি তাহা সংহরণ করিতে জানিতেন না, তিনি কখনই উহা প্রয়োগ করিতেন না। ভারতের মহাবীরগণ 'এঁচড়ে-পাকা' ছিলেন না। কোন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানলাভ না করিয়া তাহা ব্যবহার করিলে, বালকের হস্তে ধারাল শাণিত অস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান দ্বারা আণবিক বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বারা সেই বিস্ফোরণ-কার্য্য নিবারণ করিবার ক্ষমতা এখনও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ফলে ছয়ষট্টি (৬৬) আণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা পৃথিবীতে যে অমঙ্গলের সূচনা হইয়াছে, সে বিষয়ে আসুরিক সভ্যতার মালিকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

আণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে-সমস্ত ভয়াবহ কাণ্ড হইতে পারে, সে-বিষয়ে ডাক্তার কার্টষ্টার্ণ নামক জৈব-বিজ্ঞানাচার্য্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বলিয়াছেন,—"Since almost every one in the world already has radio-active strontium in bone and teeth,and radio-active iodine in the thyroid gland, their activity might increase through illness and cause generative charges which might be transmitted to posterity."

অর্থাৎ রঞ্জনরশ্মি দ্বারা প্রভাবিত ষ্ট্রনসিয়াম রসায়ন এখনি সমস্ত পৃথিবীর লোকের হাড়ে এবং দাঁতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং রঞ্জন-রশ্মি প্রভাবিত আইওডিন থাইরয়েড্ নালীতে বৃদ্ধি পাইয়া ভবিষ্যতে মনুষ্যজাতির বংশানুক্রমে জননেন্দ্রিয় ব্যাঘাত ঘটাইবে।

আমেরিকা জলের মধ্যে আণবিক বিস্ফোরণ করিয়া কোটী কোটী জলজাত মৎস্য এবং অন্যান্য জীব ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং স্থলে যখন প্রয়োগ হইবে তখন কত কোটী কোটী মনুষ্য জাতি ধ্বংস হইবে, তাহাই ভাবিয়া সকলে আকুল হইয়াছেন এবং আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীন নেতাগণ উঁহাদের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া অহিংস নীতি (?) অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ বলিতেছেন যে, তাঁহারা কখনই ধ্বংসমূলক আণবিক শক্তি ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু তাহারা আণবিক শক্তি ব্যবহার করিবেন না,—"একথা

না বলিয়া ভারতবাসী যদি তাহাদের পূর্ব পূর্ব মহাজন বা মহাবীর অর্জ্জুনের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বলিতে পারিতেন যে, তাহারা অন্যান্য জাতির আণবিক অস্ত্র-প্রয়োগ ধ্বংস করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিবেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইতাম।" অবশ্য ভারত তাহার নীতি রক্ষা করিয়া আণবিক শক্তির ক্রিয়া নষ্ট করিবার যোগ্যতা নিশ্চয়ই অর্জ্জন করিবেন, যদি তাহারা অর্জ্জুনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে পারেন।

ভারতবাসী এখন তাহাদের পূর্ব পূর্ব মহাজন বা বিজ্ঞজন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের কথা তাচ্ছিল্য করিয়া পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে "ভৌম ঈজ্যধী", বা মাটিয়া বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। এই মাটিয়া বুদ্ধিবিশিষ্ট ভারতবাসী বুঝেন না যে, তাহাদের মাটির পরিমাণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আজিকার ভারত এবং পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতের পরিমাণ অনেক তফাৎ। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারত বলিতে গেলে প্রায় সমস্ত পৃথিবী; কিন্তু এখনকার ভারত বলিতে গেলে একটি ক্ষুদ্রতম স্থল খণ্ড মাত্র। মাটিয়াবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসী ভারতের কল্যাণ এবং কৃষ্টির প্রসার করিতে ইচ্ছা করিলে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ না করিয়া, তাহাদের দেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি ভাবে ভারতের অনুসরণ করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারেন। তদ্দ্বারা ভারতবাসীর প্রভূত মঙ্গল হইবে। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান-প্রগতি, আর ভারতবর্ষের তাহা অনুকরণ প্রবৃত্তি—এই দুইটি জিনিষের সামঞ্জস্য হয় না। ৫০০ বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্য দেশে যে জড়-বিজ্ঞান সাফল্য-লাভ করিয়াছে; ভারতবর্ষ তাহা হাজার হাজার বৎসর পূর্বে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরও কোটী কোটী টাকার রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার, কলকব্জা এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধসমূহ ভারতে আমদানী এখনও হইতেছে। আমাদের ঔষধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায় বুঝা যায় যে, কোন ঔষধের দোকান শতকরা নব্বইভাগ ঔষধই বিদেশীয় এবং তাহাদের দামও অত্যধিক। কিন্তু প্রগতির যুগে ভারত সেই সেই জড়বিজ্ঞানে দক্ষতা দেখাইতে পারে নাই বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতেছে, "কেবল ঔষধের বিষয় কেন, জড়সভ্যতার যেদিকেই ফিরিয়া দেখি, মনে হয়, ভারতবাসী অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় আচার্য্য এবং শাস্ত্রী প্রত্যেক বৎসরে উৎপন্ন হইলেও তাহাদের এমন

ক্ষমতা নেই, বিদেশীয় আচার্য্যগণের সহিত পাল্লা দিতে পারেন। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে সর্বত্রই পাশ্চাত্য শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে। আমাদের ভারতীয় শিক্ষায় সকলকে শিক্ষিত করিতে পারিলে সমগ্র পৃথিবীই সর্ববিষয়ে ভারতের অধীন হইবে।"

আমরা শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট একটি কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি যখন বিলাতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের পক্ষ হইতে লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন তাহাকে 'লেডি ওয়েলিংডন' (লর্ড-ওয়েলিংডন ভারতের ভাইসরয় ছিলেন) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভারতের লোক তাহাদিগকে কি শিখাইবার জন্য আসিয়াছেন এবং তিনি আরও গর্বিত ভাবে বলিয়াছিলেন,—"আপনাদের ভারতবাসী আমাদের দেশে (লণ্ডনে) আসে এবং আমরা তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া নানারকম উপাধি দিয়া পাঠাইয়া দিলে, তাহারা ভারতবর্ষে দু'পয়সা রোজগার করিয়া খায়। সুতরাং ভারতবাসী আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতে পারেন—যাহার জন্য আপনারা কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন?"।

শ্রীল তীর্থ মহারাজ লেডী ওয়েলিংডনের কথার জবাব দিয়াছিলেন এই বলিয়া—"আমরা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি ভারতের মৌলিক কথা লইয়া আমরা পূর্ব্ব আচার্য্যগণের কথা বহন করিয়া আনিয়াছি, সেই কথা আপনারা শুনিলে নূতন আলোকের সন্ধান পাইবেন। যে—কথা আমাদের ভারতবাসীগণ আপনাদের নিকট শিখিয়া যান বা যে বিদ্যার বলে সেখানে খাইয়া বিলাত-ফেরত বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হন, আমরা সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য আসি নাই।"

পরে গোড়ীয় মঠের প্রচারকগণের কথা শুনিয়া ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, যেমন মারকুইস অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড, লর্ড ওয়েলিংডন, সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজবেণ্ড প্রভৃতি বহুলোক আকৃষ্ট হন এবং গৌড়ীয় মিশনের বিশিষ্ট সভ্যরূপে কার্য্য করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ (তখন পণ্ডিত এ, বি, গোস্বামী) বিলাতে প্রচারকালীন যখন 'World Federation of faith' সভাতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া সকলকে সেই মন্ত্র সমস্বরে উচ্চারণ করাইয়াছিলেন, তখন সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজবেণ্ড Splendid, Splendid' এই কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রায়ই হরিকথা-প্রসঙ্গে বলিতেন যে, "সমস্ত বিবদমান শক্তিগুলি একমাত্র মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের কথায় শান্ত হইবে।" বিবদমান জগৎ মায়িক বৈশিষ্ট্য, আর সেবাময় জগৎ চিদ্-বৈশিষ্ট্য। বিবদমান জগতে যে মায়িক বৈশিষ্ট্য, তাহা কোনদিনই মায়িক চেষ্টাদ্বারা সমতা লাভ করিবে না। হিংসা, অহিংসা দুইটি জিনিসই পাশাপাশি চিরদিনই থাকিবে। যাহারা হিংসাকে বাদ দিয়া অহিংসা নীতিকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন তাহারা মায়িক চেষ্টাদ্বারা মোহিত। আবার যাহাদের অহিংসাকে বাদ দিয়া কেবল হিংসাময় জগৎ বজায় রাখিবার চেষ্টা, উহাও তাহাদের আর একপ্রকার মায়িক চেষ্টা। কিন্তু যাহারা হিংসা ও অহিংসা ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহারা সেবাময় চিদ্বিশিষ্ট জগতে অবস্থান করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবানের কথায় মহাবীর অর্জ্জুন যে ক্ষাত্রনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জগতের চক্ষে হিংসাময় হইলেও, মনোধর্ম্মকল্পিত অহিংসা বা ব্রাহ্মণ-নীতি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের কথা। ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। সুতরাং তাহার বাণী এবং তিনি একই বস্তু। ভগবান্ যেমন নিত্য সত্য, পূর্ণ এবং পবিত্র, তাঁহার বাণীও সেই প্রকার নিত্য সত্য, পূর্ণ এবং পবিত্র। অতএব তিনি যে হিংসার কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, তাহা অর্জ্জুনের নিজ মনঃ-কল্পিত অহিংসা-নীতি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। সুতরাং ভগবদ্ আজ্ঞা পালন করাই জগতের অচিৎ বৈশিষ্ট্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

অশ্বত্থামা যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অচিদ্বৈশিষ্ট্য; কিন্তু অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে নিরাকরণ করিবার জন্য মহাবীর অর্জ্জুন ভগবানের আজ্ঞায় যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা সেবাময় চিদ্বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ভারতবাসীই ইচ্ছা করিলে অচিদ্বৈশিষ্ট্যের আণবিক বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা শ্রীভগবানের আজ্ঞায় উন্নতধরনের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের ন্যায় জগতকে রক্ষা করিতে পারেন। সেই চিদ্বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মাস্ত্র কি, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক।

কলিহত সমস্ত জগতের জীব কি উন্নত ধরনের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আচিরে
শিষ্যের ব্রহ্মাস্ত্র বা 'এট্‌ম বম্' নিরাকরণ করিতে পারে, তাহা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীল গোরসুন্দরের বাণীর মধ্যে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'কৃষ্ণপ্রেম'-রূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিয়াছেন
তাহা এইরূপ। যথা—

"অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঁচি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥
অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম-সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥"

(চৈ, চ, আ, ৯।৩৬-৪১)

শ্রীভগবানের কথায় যেমন মহাবীর অর্জ্জুন ব্রহ্মাবন্ধু অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রকে
সংহার করিয়া প্রজাগণকে সুখী করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার যাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
মহাপ্রভুর অনুগত ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর
আজ্ঞানুসারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সমস্ত জগতে শ্রীচৈতন্যধারায় হরিকীর্ত্তন করিয়া
এই আণবিক ব্রহ্মাস্ত্র হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করুন। আমরা দন্তে তৃণ
লইয়া এবং সকলের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, শত শত কাকুতি মিনতি
দ্বারা সমস্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভৃত্যকে অনুরোধ করি যে, তাহারা
সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত কৃষ্ণপ্রেম-ফল লইয়া জগতে
সর্ব্বত্র প্রচার করুন। আমরা এই কথা কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি-বিশেষকে
বলিতেছি না। "যাহারা গোরসুন্দরের প্রেমফল বিতরণ না করিয়া শ্রীল
রূপ গোস্বামীর কাপড় পরাকে (?) অনুকরণ করিয়া নির্জ্জন ভজনে ব্যস্ত

তাহাদেরও যেমন দুর্দ্দশা, সেইপ্রকার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
প্রতিষ্ঠিত মঠ মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া বা পৃথকভাবে মঠ-নির্ম্মাণের অনুকরণ
করিয়া তাহার প্রচার-বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া যাহারা জাত-গোঁসাইয়ের সহিত
পাল্লা দিতেছেন, তাহাদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণা-
নন্দজী 'ভিক্ষুক আইন' করিবার জন্য খুবই উঠিয়া-পাড়িয়া লাগিয়াছেন। সুতরাং
"সাধু সাবধান, সাধু সাবধান !!" শ্রীল গোরসুন্দরের কথা জগতে বিতরণ না
করিয়া কূপমণ্ডুকের মত যাহারা নিজ নিজ পেটোয়া লোক লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া
আছেন, তাহাদের অশোভন জীবন শ্রীগোরসুন্দর আর বেশীদিন সহ্য করিবেন
না। "এখন হইতে সাধু সাবধান ! পুনরায় কহি সাধু সাবধান !! সকলে
সঙ্ঘবদ্ধ হউন। কলিহত জীব অপরাধ করিবেই এবং করিয়াই থাকে। সেই
জন্য গোরসুন্দর তাহাদের সরলতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে নাকচ
করিয়া দেন না।" ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে—"It is better late
than never" একেবারে গোরসুন্দরের কথা অমান্য করা অপেক্ষা একটু
দেরীতেও মান্য করা ভাল। সে জন্য আমাদের অনুরোধ,—"শ্রীশ্রীগোরসুন্দরের
শরণাগত বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই একত্র মিলিত হউন্।
হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্যগণ অনেক সুবিধা করিয়া রাখিয়াছেন। বৃথা
সময় নষ্ট না করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গোরসুন্দরের বাণী সমস্ত জগতে প্রচার
করা হউক। মিশনারী কার্য্য চালাইতে হইলে বহু লোকের এবং বহু অর্থের
আবশ্যক। ইহা কোন বাহাদুর ব্যক্তির একার ক্ষমতা নহে।" স্বয়ং ভগবান
গোরসুন্দর আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নিজেকে 'একা'
দুর্ব্বল (?) মনে করিয়া বলিয়াছেন,—

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পারিয়া বিলাব ॥"

সুতরাং আমরা সমস্ত পীর সাহেবদের অনুরোধ করি যে, একাই 'পীর-
বাবুর্চি-ভিস্তিধর' হইয়া কোন কাজ হইবে না। **"জটিল সমস্যা"** আরও
"জটিলতরই" হইয়া যাইবে।

ভাগবত জীবন

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতৃদেব অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি সাধুমার্গ সম্বন্ধে এইপ্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্ন-ধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥

(ভাঃ ৭।৫।৪)

অর্থাৎ "হে অসুরবর্য্য পিতৃদেব ! আমি সেই পন্থাকেই সাধু মনে করি যাহাতে দেহধারিগণ (জনসাধারণ), সংসার-জ্বালায় সদাসর্ব্বদা সমুদ্বিগ্নচিত্ত অবস্থার আগারস্বরূপ এবং আত্মঘাত করিবার আবাস-স্বরূপ গৃহ-অন্ধকূপ ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে।"

মনুষ্য-জীবন অত্যন্ত দুর্ল্লভ জীবন—একথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই দুর্ল্লভ জীবন পাওয়া যায় এবং এই জীবনে শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার একমাত্র সুযোগ। কোটি কোটি জন্মের যে ভুল অর্থাৎ "কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥"—তাহা এই জীবনেই সংশোধন করিতে পারি। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস,' কিন্তু সে যখন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করিতে পরাঙ্‌মুখ হয় অর্থাৎ মিথ্যা ভোক্তা হইবার অভিমান করে, তখন তাহার কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার সেবা আরম্ভ হয়। এই সেবাও কৃষ্ণের ব্যতিরেকে সেবামাত্র ; সুতরাং জীব ভোক্তা অভিমান করিলেও তাহার স্বরূপের নিত্য-কৃষ্ণদাসত্ব-ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া জীব মনে করে 'আমি একজন মস্তবড় ভোক্তা, আমি স্বাধীন, আমি কাহারও চাকর নহি, আমিই ভগবান্' ইত্যাদি ; কিন্তু আসলে সে মায়ার রচিত বহু প্রকার রমণীয় বৈভবের সেবা করিয়া উত্তরোত্তর কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া কোন অন্ধতম নরকে চলিয়া যায়, তাহার ঠিক নাই। ভোক্তাভিমানে জীব কি চায় ? সে চায়—উত্তম স্ত্রী, উত্তম খাদ্যদ্রব্য,

উত্তম যান-বাহন, উত্তম আবাস, উত্তম আসন, উত্তম বসন, প্রসাধন, আ[...] যত প্রকার কল্পনার মধ্যে আসিতে পারে, সেগুলি সব। "সে যাহা চায়, সেইগুলিই মায়াশক্তির অষ্টপ্রকার ভূতাদি উপাদান, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি আটটি তত্ত্ব বহু প্রকারে অদল-বদল করিয়া এবং সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র-প্রসূত ১০টি কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি সব একত্রিত করিয়া একটি সুন্দর প্রহেলিকাময় ভূতের বাড়ী।" ইহার মধ্যে ভোক্তাভিমানী জীব প্রবেশ করিয়া অনেক প্রকার ভৌতিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া সেইসকল মায়ার ২৪ তত্ত্বের সেবা করিতে থাকে মাত্র।

মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির প্রভাবে সে বুঝিতে পারে না যে, সে তখনও ব্যাতিরেকভাবেই কৃষ্ণের ইচ্ছা পূরণ করিতেছে ; কারণ মায়ার এইসব বৈভবের কারণ ও ভগবদ্বিভূতি, সেগুলি সবই ভগবানেরই শক্তি-পরিণাম মাত্র —ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তি। অব্যক্ত মূর্ত্তির সেবা জীবের কেবলমাত্র ক্লেশদায়ক, তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

(গীঃ১২/৫)

মধ্যে মধ্যে জীব ক্লেশ অনুভব করিয়া তাহা হইতে যে কাল্পনিক মুক্তি-চেষ্টায় কার্য্য করে, তাহাও মায়ার বৈভব এবং সেইটিও ক্লেশদায়ক। অব্যক্তের সেবা করিতে করিতে, জীব যৎপরোনাস্তি কষ্ট পায় এবং সাধু-গুরুর কৃপায় যদি সে মায়াপিশাচী ছাড়াইবার ঔষধ পায়, তবেই তাহার মঙ্গল হয়। তখন মায়ার সেবার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আবার কৃষ্ণসেবার অধিকার জন্মে, এবং যে পরিমাণে তাহার কৃষ্ণসেবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে তাহার আনন্দময় জীবনের আস্বাদন হয়। ক্রমশঃ তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়, মায়ার নেশা কাটিয়া যায় এবং সাধুগুরুর কৃপায় তাহার দৈনন্দিন কার্য্যগুলি বিধিভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া এই জীবনেই সে কৃষ্ণধামে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয়।

কৃষ্ণধামে যাইবার যে বিদ্যা, সেটি সকলবিদ্যার রাজা। গীতায় সেই বিদ্যাকে রাজগুহ্য, রাজবিদ্যা, পবিত্র এবং প্রত্যক্ষাবগম ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মায়িক বা জড় বিদ্যাগুলি মায়ার সেবা করিবার

বিবিধ উপায় মাত্র। জীবিকা-উপার্জ্জন করিবার জন্য লোকে কেহ ব্যবসা-
বিদ্যা, কেহ চিকিৎসা-বিদ্যা, কেহ আইন-বিদ্যা, কেহ স্থপতিবিদ্যা, কেহ
রাসায়নবিদ্যা, কেহ পদার্থবিদ্যা, শেষ পর্য্যন্ত 'আমি ভগবান্ হইব' বা 'অবতার
হইব' প্রভৃতি মত অবলম্বন করে। এই-সব বিদ্যাই অবিদ্যা মাত্র। কারণ
ঐ সকল বিদ্যার দ্বারা মায়ার সেবাবৃদ্ধি ছাড়া অর্থাৎ ক্লেশলাভ ব্যতীত আর
কিছুই লাভ হয় না। জীবনে একটি মাত্র বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইলে
যত কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু এ
পরিশ্রম করিয়া যে এম, এ, পি-এইচ-ডি পদ প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার দেহ
শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই সব অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; আবার যদি মনুষ্য-
জন্ম লাভ হয়, তখন আবার পরিশ্রম করিয়া ঐ বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়;
কিন্তু মনুষ্যজন্ম যদি কোনপ্রকারে ভাগ্যচ্যুত হয়, এবং তাহারই সম্ভাবনা বেশী,
তবে সে বিদ্যাই মাটি। মূর্খলোক কিন্তু এই সব কথা কিছুই বুঝে না।
মায়ার দাসত্ব করিতে করিতে তাহার এতই মাথা খারাপ হইয়া যায় যে, তাহার
ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এইসব কথা প্রবেশই করিতে চাহে না। সেই সকল মায়াদুষ্ট
দুষ্কৃতিমান্ ব্যক্তিগণ মনে করে 'এইত বেশ আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, লক্ষ-লক্ষ
টাকা রোজগার কর্‌ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, মিটিং কর্‌ছি, প্ল্যান করছি, সুখের
স্বপ্ন দেখছি, ভগবানের বাবা হ'য়ে গেছি, আবার কি চাই? বোকা বৈষ্ণবগুলির
মত মরবার পর কি হবে, সেই ভেবে ভেবে শরীর 'নষ্ট করে লাভ কি?'—
ইত্যাদি। কিন্তু হতভাগারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, মরিবার পরও জীবন
আছে।

"জীব নিত্যবস্তু; তাহার মরণ নাই, তাহার জন্ম নাই, তাহার ভূত,
ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নাই; সে শাশ্বত নিত্য বস্তু, তাহার একটি শরীর নষ্ট হইলে
সে আবার একটি শরীর প্রাপ্ত হয়—যতদিন না সে মুক্তি পায়।" যেমন লোকে
একখানি বস্ত্র গ্রহণ করিয়া অন্য একখানি বস্ত্র ত্যাগ করে, সেই প্রকার এক
দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করে। পারমার্থিক রাজ্যের এই সব
'অ-আ-ক-খ-' কথা আমরা গীতাতে বহুবার পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আমি
কি কোন একদিন গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি; যে আমার মরণের
পর কি-শরীর লাভ হইবে? আমি মরণের পর যে শরীর লাভ করিব, তাহা কি
মানুষের শরীর হইবে, না শূকরের শরীর হইবে? এক প্রকার সুবিধাবাদী
লোক মনগড়া সিদ্ধান্ত করে যে, একবার মানুষ হইলে পর মানুষের শরীরই

মানুষের শরীর হইলে ত' বেশ ভাল করিয়া চপ্, কাট্‌লেট্ মদ্য-
লাভ হয়। কিন্তু অন্য কথাও ত আছে, সুতরাং যদি মানুষের
মাংস খাওয়া চলিবে। তাহা হইলে ত ঐ চপ্-কাট্‌লেট খাইবার পর
বদলে শূকরের শরীর লাভ হয়, বিষ্ঠারূপে পরিত্যক্ত হইবে, শূকর শরীরে
যে সার অংশ ফস্‌ফরাস সংযুক্ত হইয়া একটা দায়িত্ব গ্রহণ করা কি বুদ্ধিমান
তাহাই খাদ্য হইবে। বাস্তবিক এই রকম আছে—ইহার প্রমাণ সমস্ত বেদ-বেদান্ত
ব্যক্তির কর্ত্তব্য? মরণের পর জীবন আছে। কিন্তু মরণের পর জীবন
শাস্ত্র এবং ইতিহাসে প্রজ্জ্বলিত ভাষায় লিখিত অনুগমনকারী নাস্তিকগণ।
নাই ইহার প্রমাণ—একমাত্র চার্ব্বাক মুনি বা তাঁহার লোক ঠকান, কিন্তু বেদ-
নাস্তিকতার প্রমাণ কেবল বাক্‌চাতুর্য্য এবং বোকা বড় বড় রাজর্ষি, দেবর্ষি বা
বেদান্তের প্রমাণ, গীতা-ভাগবতের প্রমাণ চিরদিন লইয়াছেন। ভোট-রঙ্গ করিয়া কি
তদনুগ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বৈষ্ণব সকলেই মানিয়া লোকের অনুমানসর্ব্বস্ব প্রমাণ
শ্রুতির অকাট্য প্রমাণ ত্যাগ করিয়া মূর্খ বোকা
গ্রহণ করিতে হইবে? সকল প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। এ বিচার
পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ বহুবার করিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আবার বিচার
করিতে পারা যাইবে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহারা, তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ
সর্ব্বভূতের হিতৈষী ঋষিগণের প্রমাণিত বাক্য গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন
করিবেন। জীবের জীবন অনিত্য নহে—তাহা নিত্য, এবং যেহেতু সে নিত্য,
তাহার নিত্য-সুখেরও সন্ধান ঐ শ্রুতিপ্রমাণে পাওয়া যাইবে। "নাস্তিকের
কথায় জীবন ভাসাইয়া না দিয়া ঋষিগণের বা মহাজনগণের আদর্শই আমাদের
গ্রহণীয়। তাহা যদি না করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বিপথগামী
হইব।"

"নরদেহরূপ নৌকায় চড়িয়া, সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপ নাবিক ও কর্ণধারের সাহায্য
পাইয়া এবং ভগবদ্ভজনরূপ অনুকূল সহযোগ পাইয়াও আমরা যদি জন্ম-মৃত্যু-
জরা-ব্যাধিরূপ সংসার-সাগর পার হইতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা
আত্মঘাতী হইব। সমস্ত বেদ-বেদান্ত, গীতা-ভাগবত, পুরাণাদি-প্রমাণে আমরা
ইহাই বলিতে পারি যে, পরম ব্রহ্ম একমাত্র ভগবানই তাহার স্বাংশ, বিভিন্নাংশ,
অংশ, কলা, প্রকাশ, স্বরূপ-শক্তি, মায়া-শক্তি, প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে নিজকে
বহুভাবে বিস্তার করিয়া বিলাস করিতেছেন। মায়িক ভোগবিলাসের মধ্যে
যেমন তাপ এবং বিচ্ছিন্নতা বর্ত্তমান থাকে, অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের চিদ্বিলাসের
মধ্যে সেই প্রকার তাপকারী নিরানন্দ নাই। নিছক নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ

করিতে হইলে ভগবানের সেই চিদ্বিলাস আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহ জগতে যেমন কোন ধনীলোক নিজেকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার দ্বারা অন্তরঙ্গ বিভাগ করিয়া, ভৃত্য, যান-বাহনাদি, গৃহ, উদ্যান, ভোজন, আচ্ছাদন প্রভৃতি বিস্তার করিয়া নিজ শক্তি ও নিজ অংশদ্বারা ভোগাবিলাস করে, ঠিক সেই রকমেই যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সমস্ত জগতের মহেশ্বর ভগবান্, তিনিও নিজেকে ঐভাবে বিস্তার করিয়া নিত্যকাল ভোগাবিলাস করিতেছেন। "ধনী লোকের বাড়ীর ভিতর বা অন্তরঙ্গের ভিতর প্রবেশ না করিতে পারিয়া কেবল বাহিরের চাকৃচিক্য দেখিয়া যেমন একপ্রকার লোক ঐ ধনীলোক সম্বন্ধে সবজান্তা হইয়া থাকে, সেইপ্রকার ভগবানের নিত্যলীলা, অন্তরঙ্গ শক্তির বিলাসচাতুর্য্য না বুঝিতে পারিয়া বাহিরের নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্ত্বার জ্যোতি বা চাকৃচিক্য দেখিয়া একপ্রকার অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোক নিজ বুদ্ধিবশে পরতত্ত্ব যতটা জানিতে পারে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ফলে সেই চিদ্বিলাসের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ না করিয়া আবার এই মায়িক ভগ্ন-পরিচ্ছিন্ন-তাপকারী বিলাসের মধ্যে আসিতে বাধ্য হয়।"

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্য-সেবক। ভগবানের বিলাসে যোগানদার হইয়াই সে চিদ্‌বিলাসের আনন্দ অধিক উপভোগ করে। বড় লোকের বাড়ীর চাকর-চাকরাণীও যেমন সুখে থাকিবার, আনন্দে থাকিবার অনেক সুবিধা পায়, সেইপ্রকার জীবও ভগবানের নিত্যলীলা-চিদ্বিলাসের সহযোগী হইয়াই নিত্যানন্দ লাভ করে। অদ্বয়জ্ঞান-ভূমিকায় ভগবান্ ও তাঁহার সেবক এক জাতীয় তত্ত্ব। অতএব স্বভাবতঃ জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া যখন সে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা হইতে বঞ্চিত হয়, তখনই তাহাকে বহিরঙ্গা শক্তির অধীনে ভোক্তার মিথ্যাভিমানে মায়াশক্তি-প্রকটিত ত্রিগুণের দাসত্ব করিতে করিতে হয়রাণ হইয়া যাইতে হয়। ভগবানের সাক্ষাৎ সেবাতেও জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস আবার ভগবচ্ছক্তি মায়ার সেবাতেও সে নিত্য-কৃষ্ণদাস। কারণ ভগবানের মায়াশক্তি, ও শক্তিমান-তত্ত্ব ভগবান্—সূক্ষ্মবিচারে অভিন্ন তত্ত্ব। মায়ার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সেই মায়ার সেবা আর ভগবানের সেবা এক নহে। "যেমন জেলে থাকিয়া রাজার সেবা করিতে হয়, আবার জেলের বাহিরে থাকিয়াও রাজার সেবা করিতে হয়। কিন্তু প্রথম সেবাটি অর্থাৎ জেলের সেবাটি তাপকারিণী, আর দ্বিতীয় সেবাটি অর্থাৎ জেলের বাহিরে আসিয়া সেবা কার্য্যটি আনন্দময়। অতএব সেই আনন্দময়ী সেবা

শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে কৃষ্ণের সংসার করিতে হইবে।" কৃষ্ণের সংসার করিতে পারিলে দৈবী মায়ার কবল হইতে তখনই রেহাই পাইব। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' কৃষ্ণ-সেবাময় জীবন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত নির্গুণ জীবন। যিনি অব্যাভিচারিনী সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি সমস্ত মায়িক গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত অবস্থায় সর্বদাই বর্ত্তমান থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে পরাভক্তি বা কেবলা ভক্তির অধিকারী হন। অতএব প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের গৃহকে ভগবৎ মন্দিররূপে পরিণত করিবেন। কারণ ভগবন্মন্দিরে বাস নির্গুণ বাস। ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের অব্যাভিচারিণী সেবায় পাঞ্চরাত্রিকী অর্চ্চনমার্গে বা ভাগবতমার্গে নিযুক্ত থাকিলেই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেই পরাশক্তির অধীনে আনন্দময়ের অভ্যাসদ্বারা সেই পরমপদ ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে।

অতএব আমরা প্রত্যেক গৃহস্থই যাহাতে জীবনের অমূল্য সময় এইভাবে নিযুক্ত করিতে পারি, তাহারই একটা মোটামুটি আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অর্দ্ধতিলমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া এইভাবে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিবেন। এই রাজগুহ্য ধর্ম্ম যাজনের দ্বারা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে সর্বতঃ সুখানুভব এবং আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। "কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিবার পূর্বেই কৃষ্ণের নিজজন শাস্ত্রসিদ্ধ আচার্য্যের অর্থাৎ সদ্‌গুরুর প্রথমেই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; এবং তদনন্তর প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের দ্বারা এবং সেবানুকূল হইয়া মহাজনের প্রদর্শিত পদাঙ্কানুসরণ করিবেন। তবেই অল্পায়াসে সহজ রাস্তায় যাইবার সুবিধা পাইবেন—জীবনে কোনপ্রকার ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।" মহাজনের পদানুসরণ করিবার অভিলাষী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশমত জীবন যাপন করিতে পারিলেই কৃষ্ণের সংসার করা সম্ভবপর হয়। কৃষ্ণের সংসারে কোন প্রকার অনাচার প্রবেশ করিতে পারিবে না। অনাচার অর্থে চা, বিড়ি, পান, তামাক, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, পিঁয়াজ, রসুন, অনর্থক খেলাধূলা, মনোরঞ্জন, বায়স্কোপ-থিয়েটার, বাজে গল্প, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা—এগুলি সবই কৃষ্ণের সংসারে প্রতিকূল জানিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক যে, এই অনর্থরূপ মায়ার জাল বিস্তারই আমাদের সর্বনাশের কারণ। সাধারণ বেকার সমস্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণও এইগুলি। এইগুলি যত

বাড়িতেছে, সংসারে বর্ণসঙ্কর ও বেকার-সমস্যাও তত বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং
ঐগুলি নিশ্চয়ই ত্যাগ করিতে হইবে। সতর্ক থাকিলে এবং কৃষ্ণ-সেবাময়
জীবন গঠিত হইলে ঐ মায়ার জাল অনর্থগুলি আপনা-আপনিই বিলীন হইয়া
যাইবে। এই চেষ্টা করাটাই আমাদের তপস্যা জানিবেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার
জন্য যতদূর সম্ভব উত্তম খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ, শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরাদি সাজাইবার
জন্য যতদূর সম্ভব উত্তম প্রসাধন-সামগ্রী একত্রীকরণ এবং তজ্জন্য যতদূর
সম্ভব পরিশ্রম করা, কৃষ্ণের শৃঙ্গারাদি মনোরমভাবে সম্পন্ন করিয়া তাহাই দর্শন
করা, কৃষ্ণের আরাত্রিকের সময় মনোরম বাদ্য সংযোগে কীর্ত্তন করা এবং
তাহার জন্য যাহার যত গৌরবিহিত বাদ্য কীর্ত্তনের বিজ্ঞান জানা আছে,
তাহা নিযুক্ত করা, সম্ভব হইলে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নানাভাবে নৃত্যাদি করা,
সকলই কৃষ্ণসেবার অনুকূল কার্য্য, সুতরাং তাহা হইতে বিরত হওয়া উচিত
নহে। প্রত্যেক মাসেই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব, তিরোভাব তিথিগুলির
সম্মান করিয়া ২।১ টা উৎসব করা এবং সম্ভব হইলে ঐ সব উৎসবে নিজের
কুটুম্বাদিকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার দর্শন করাইয়া,
মধুর কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করাইয়া এবং ভগবৎ প্রসাদ দিয়া তাহাদিগকেও এই
কার্য্যে উৎসাহিত করা আবশ্যক। প্রসাদ বিতরণকারী এবং প্রসাদ সম্মানকারী
সকলেই বৈকুণ্ঠের যাত্রী জানিবেন। সুতরাং ঐ উৎসবে যোগদানকারী
সকলেই ভাগ্যবান্। মাসে দুইবার একাদশীর ব্রত পালন করিয়া দ্বাদশীর
দিন উৎসব করিবার চেষ্টা করিবেন, এবং বৎসরে একবার বা দুইবার ভগবল্লীলা-
স্থলী তীর্থস্থানে যাইয়া প্রকৃত সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ
করিবেন; তদ্দারা শরীর মন এবং আত্মার একত্রে সুখ বিধান হইবে।
পরিক্রমা করিবার উদ্দেশ্য ভক্ত ও ভগবানের স্থান মোটামোটি মথুরা, বৃন্দাবন,
দ্বারকা, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, নবদ্বীপ, মায়াপুর এবং গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিতা
তীর্থসমূহ। এইভাবে নিজেকে এবং নিজের পরিবার বর্গকে সর্ব্বদাই আনন্দ-
চিন্ময় রসের সহিত নিযুক্ত রাখিলে আর কদর্য হেয় জড় রসের প্রতি আসক্তি
থাকিবে না। জড় রসের আসক্তি ঘুচিয়া যাওয়া মানেই জড়মুক্তি; সুতরাং
উহা কৃষ্ণের সংসারের আনুসঙ্গিক ফল। জড় রস বিবর্জিত শুদ্ধ আনন্দ চিন্ময়
রসের বাসস্থানগুলি সবই বৈকুণ্ঠ লোক। 'যেদিন গৃহেতে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়'—এই মহাজনবাক্য প্রত্যক্ষ অনুভব করিবেন।
ইহাই মানুষ্যজীবন সার্থক করিবার একমাত্র পথ। এইভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের

সেবাময় জীবনই সুখময় পরোধর্ম্ম জীবন এবং ভগবানের মহি[illegible]
করিবার একমাত্র সরল উপায়। যেমন ক্ষুধার সময় আহার করিলে নিজে-
নিজেই আনন্দ এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুভব করা সম্ভব হয়, সেইপ্রকার ভাগবত-
জীবন যাপন করিলে ভগবৎ তত্ত্বও অনায়াসে উপলব্ধি হয়।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ॥
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
(ভাঃ ১/২/১৮-২০)

কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করিবার জন্যই আমাদের সব কিছু চেষ্টা। শুষ্ক
নিরস নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী ন্যাংটা সন্ন্যাসী হইবার কোনই প্রয়োজন
নাই। যদি এইভাবে এবং সরলভাবে কেহ কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিতে
পারেন তবেই তাহার ইহজগতেই বৈকুণ্ঠ-বাস সম্ভব হয়। আর অন্য আসুরিক
সংসার পত্তনের দ্বারা রাবণের সংসারের মত ২।৪ দিনের জন্য হকচকানী
দেখা গেলেও শেষপর্যন্ত সেই সংসারের নাশ এবং পরিশেষে নরক বাসই সম্ভব
হয়। সেই প্রকার নরক বা গৃহান্ধকূপ ত্যাগ করিয়া সদা উদ্বিগ্নময় জীবন
যাপন ছাড়িয়া দিয়া যিনি বনে গমন করেন বা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পদাশ্রয়
করেন তাঁহারাই 'সাধু'। যিনি কৃষ্ণের সংসারে বাস করেন সেই 'সাধু' এবং
যিনি রাবণের সংসার ত্যাগ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদাশ্রয় গ্রহণ করেন সেই
'সাধু' উভয়ে এক পর্য্যায়ভুক্ত।

"বসুধৈব কুটুম্বকম্"

অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত প্রকার জীবকুল আছেন 'সবই আমার আত্মীয়' এই প্রকার বিশাল বিশ্ব-প্রেম বা universal brotherhood একমাত্র কৃষ্ণভক্তেরই সম্ভব হয়। কৃষ্ণভক্ত জানেন যে, যেখানে যত প্রকার জীব আছেন সকলেরই বীজপ্রদ পিতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্‌গীতায় জীব এবং ভগবান্ উভয়েই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া প্রোথিত হইয়াছেন এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ধান্য ক্ষেত্রের যেমন নিজে নিজে ধান্য উৎপন্ন করিবার শক্তি নাই, সেই প্রকার প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রেরও নিজে নিজে জীব উৎপাদন করিবার শক্তি নাই। অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় বা মোটা-বুদ্ধির লোক, প্রকৃতি হইতে জীবের উৎপত্তি হয়—এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে পরম ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরমেশ্বর যখন জীবরূপ তাঁর বিভিন্নাংশ পরাশক্তিকে অপরা-শক্তিতে বীজরূপে প্রদান করেন, তখনই প্রকৃতি কর্ত্তৃক মায়িক বহুমূর্ত্তি-বিশিষ্ট জীব প্রস্তুত হয়। এবং এই মৌলিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইয়া সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া যেখানে যত প্রকার জীব বর্ত্তমান আছে, তাহারা সকলেই ভগবানের সম্বন্ধে পরস্পর আত্মীয় কুটুম্ব। যাহারা ভগবানকে বুঝিতে পারে না, যাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান নাই বা যাহারা পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত, তাহারা কখনই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এই কথা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ভগবৎ সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে বিশ্বপ্রেমের কাঁদুনী তাহাও 'দুরত্যয়া' মায়ার আর এক প্রকার ছলনা।

'১' (এক) এই অঙ্কের পরে '০' (শূন্য) যতই বসান যায়, ততই মূল্য বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যদি এককে বাদ দিয়া অনন্তকোটি শূন্য স্থাপন করা যায়, তবে শূন্যের যেমন কোনই মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না, সেই প্রকার ভগবানকে বাদ দিয়া যে বিশ্বশান্তির ছলনা বা কাঁদুনী তাহা কোন দিনই সাফল্য-মণ্ডিত হইবে না। classless society বা একজাতীয় সমাজ তখনই সম্ভব হইবে যখন মেটোবুদ্ধির লোকগুলি ভগবৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শিখিবে। নিরীশ্বরবাদীর বিশ্বপ্রেমের ছলনা বিদ্বৎ-সমাজে আদৃত হয় না। মেটোবুদ্ধি

সম্পন্ন লোকগুলি বিচার করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে ভগবানই সমস্ত চরাচর বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব—

"সে সম্বন্ধ নাহি যা'র বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥"

অপরা বা জড়া প্রকৃতি হইতে পরাপ্রকৃতি জীবতত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক। আবার সমস্তই ভগবানের শক্তিপুঞ্জ বিচারে সমস্ত শক্তিই পরস্পর সম্বন্ধিত এবং এক। ইহাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের নিগূঢ় কথা। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলেই বিভিন্ন মূর্ত্তি বা বিভিন্ন শক্তি-সম্পন্ন জীব এবং সকলেরই পিতা শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মাকে আমরা পিতামহ বলিয়া থাকি; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মারও পিতা বলিয়া তিনি প্রপিতামহ রূপে ভগবদ্‌গীতায় ঘোষিত হইয়াছেন। যথা—

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্, গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস, ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমোস্তেঽস্ত সহস্রকৃত্বঃ, পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

(গীতা ১১।৩৭-৩৯)

হে মহাত্মন্, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মারও আদি কর্ত্তা, অতএব সকলেই তোমাকে কেন নমস্কার করিবে না? হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত তত্ত্ব এবং অচ্যুত। ৩৭ ॥

তুমি আদিদেব সনাতন পুরুষ। তুমিই এই জগতের একমাত্র নিবাসস্থান। তুমিই বেত্তা এবং বেদ্য এবং গুণাতীত বস্তু। হে অনন্তরূপ এই বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। ৩৮ ॥

তুমি বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ। তোমাকে আমি সহস্রবার নমস্কার করিতেছি এবং পুনরপি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। ৩৯ ॥

অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও আদি এবং সকলেরই পিতা। ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর ব্রহ্ম-সংহিতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত দেবাদি তির্য্যক যোনিতে যত প্রকার মূর্ত্তি দেখা যায় সকলেরই বীজপ্রদ পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং মাতা মহৎযোনি ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

(গীতা ১৪।৪)

সৃষ্টি-উৎপত্তির কারণ যে কেবল প্রকৃতি ইহা ভ্রমাত্মক। পিতামাতা সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি সম্ভব হয় না। জগতের যাহা কিছু কার্য্য, তাহা জীবকুল আছেন বলিয়া সম্ভব হইতেছে। জীবকুল যদি না থাকিত তাহা হইলে জগতের কোনই বৈশিষ্ট্য থাকিত না। জীবকুল আছেন বলিয়াই জড়াপ্রকৃতির উদ্ভব ও বৃদ্ধি সম্ভব হইতেছে। সুতরাং জড়াপ্রকৃতির উৎকর্ষ জীবকুল-দ্বারাই সম্ভব হইতেছে। জড়াপ্রকৃতিকে নাড়াচাড়া করিয়া জীবকুল যে ভোগের চেষ্টা করে তাহাই প্রকৃতপক্ষে জগৎ। আর জীবকুলের পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী বলিয়া আমরা সকলেই জানি। উৎপত্তিকালে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সকল জীবই স্বভাব অনুযায়ী সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সঙ্গ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। এবং সেই ত্রিগুণের বহুপ্রকার মিশ্রিত গুণে প্রভাবিত হইয়া জীব বহু মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। যেসকল পণ্ডিত জীবনীচয়কে গুণবর্জ্জিত অবস্থায় দর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-দর্শন সম্ভব হয়। পীত, নীল এবং রক্ত এই তিনটি প্রধান রং কিন্তু এই তিনটি রং এর সংমিশ্রণ কলানৈপুণ্যে বহু প্রকার রং-এর দর্শন সম্ভব হয়। চিত্রকলাবিদ্গণ কিন্তু এই তিনটি রং-ই প্রধান জানেন। পীত রং সত্ত্ব গুণ, রক্ত রজোগুণ এবং নীল তমোগুণ। যেমন রং-এর মিশ্রণে বহু রং দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার গুণের মিশ্রণে বহু জীবের দর্শন হয়। রংটি বাদ দিলে যেমন দ্রব্য নির্ম্মল হয়, সেইরূপ জীবও গুণাতীত অবস্থায় নির্ম্মল

হয়। নির্ম্মল হইলে সর্ব উপাধি নষ্ট হয় এবং তখনই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই দর্শন সম্ভব হয়। অতএব রঙ্গীন দর্শন না করিয়া নির্ম্মল দর্শন করিবার কি পদ্ধতি তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। শাস্ত্রকারগণ বলেন, 'তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্'। 'তৎ'—অর্থাৎ, ব্রহ্ম-পরা চেষ্টার দ্বারা নির্ম্মলত্ব লাভ হয়।

মনুষ্য-জাতির মধ্যে সত্ত্বগুণ-প্রধান মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত, রজোগুণ প্রধান মনুষ্যগণ ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত, রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত গুণ-প্রধান মনুষ্যগণ বৈশ্য নামে অভিহিত এবং তমঃপ্রধান মনুষ্যগণ শূদ্র নামে-অভিহিত। ঘোর তামসাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ শূদ্রাধম, চণ্ডাল, যবন, অন্ত্যজাদি নামে অভিহিত। উপরোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং চণ্ডালাদি শূদ্রাধম মনুষ্যগণ অল্প-বিস্তর সকল দেশেই সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে। কোন দেশ বা সমাজবিশেষে কেবল ব্রাহ্মণই জন্মগ্রহণ করেন, আর কোন দেশ বা সমাজবিশেষে কেবল চণ্ডালাদি শূদ্রাধম বা শূদ্রই জন্মগ্রহণ করে, এরূপ ধারণা যেমন ভ্রমাত্মক, সেইরূপ ব্রাহ্মণের পুত্র যে ব্রাহ্মণই হইবে বা চণ্ডালের পুত্র যে চণ্ডালই হইবে এরূপ ধারণাও ভ্রমাত্মক। মূলবীজপ্রদ পিতা স্বয়ং ভগবান্; সুতরাং জীবমাত্রেই সকলেই ভগবানের পুত্র। মায়া বা জড়া প্রকৃতির মধ্যে আকর্ষিত হইয়া তাহাদের অনাদি কর্ম্মফল-সঙ্গ হেতু ত্রিগুণাত্মক দেহাদিলাভ হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল বিভ্রান্ত জীবকুলকে পরম পিতা ভগবানের বশ্য করিতে পারিলেই বা ভগবানের সেবা কার্য্যে লাগাইতে পারিলেই, তাহারা ত্রিগুণাতীত হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণদাস জীব তাহা উপলব্ধি করিয়া নিত্যানন্দ লাভ করে। সুতরাং যাহাদের "বসুধৈব কুটুম্বকম্" দর্শন হইয়াছে তাহারা জীবের নিত্যানন্দ লাভের চেষ্টারূপ কার্য্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবে দয়ার কার্য্যের নিদর্শন মনে করেন। প্রকৃতিজাত জীবগণের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি হয়, সে বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এইভাবে নির্দেশ দিলেন। যথা—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

(গীতা ১৪।১৮)

আমরা উপস্থিত যে ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছি তাহা চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক। ঊর্দ্ধে যে সকল লোক আছে বা ভুবন আছে তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মলোক বা

যেখানে ব্রহ্মা স্বয়ং অবস্থান করেন, সেই স্থান সর্ব্বোচ্চ। সুতরাং ব্রহ্মবাদী সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মনুষ্যগণ তপস্যা প্রভাবে সেই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। রজোগুণ-বিভাবিত ব্যক্তিগণ ভূলোক হইতে স্বর্গলোকাদি মধ্যস্থিত ভুবনে থাকিতে পারেন কিন্তু তমোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ জঘণ্যবৃত্তি-জণিত সর্ব্ব-নিম্নস্থিত ভুবনে অথবা নরকে বাস করে।

"বসুধৈব কুটুম্বকম্" বিচারে যাহারা classless society তৈয়ারী করিয়া পরোপকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া এই ত্রিগুণতাড়িত জীবনিচয়কে গুণাতীত অবস্থায় সহজেই জানিতে পারেন—একমাত্র কৃষ্ণভক্তির দ্বারা। কারণ যে সকল ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের দ্বারা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হন, তাহারা নিশ্চয়ই ত্রিগুণাদি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হইয়া যান অর্থাৎ নির্মলত্ব লাভ করেন। যথা—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

(গীতা ১৪।২৬)

মহাত্মা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সর্ব্বপ্রথমে সোমগিরি সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈতবাদিগণের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মানন্দ সিংহাসন লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর যখন ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন তখন তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি থাকিলে মুক্তিদেবী, যাঁর জন্য অদ্বৈতবাদিগণ বহু কৃচ্ছ্রসাধনা করেন, তিনি ভক্তদিগের নিকট মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বদাই সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্যাম-সুন্দর মুরলীধরে যিনি ভক্তিযোগ সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মভূত অবস্থা বা নির্ম্মল অবস্থা সহজেই লাভ হয়।

মহাবদান্য অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর যে শিক্ষাষ্টক আমাদের দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রথমেই "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনম্" ইত্যাদি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনেরই জয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু বা দুইটি একই বস্তু। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন দ্বারা কর্ম্মজ্ঞান পর্য্যায়ের যে চরম ফল-চিত্তশুদ্ধি, তাহা সহজেই লাভ হয়। এই চিত্তশুদ্ধিলাভই ব্রহ্মানুভূতি নির্ম্মলত্ব। শ্রীগৌরসুন্দর প্রবর্ত্তিত নিরপরাধ সংকীর্ত্তনই জীবের স্বরূপানুভূতি-নির্ম্মলত্ব লাভের একমাত্র উপায়।

ভগবান্ ভক্তির দ্বারা লভ্য হয় —একথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি এবং আনুসঙ্গিকভাবে যে মায়ামুক্তি হয় তাহাও আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। অতএব নির্ম্মলত্ব লাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রপত্তিই প্রধান কার্য্য।

॥ শ্রীগোপান্নার ভক্তিযোগ ॥

(গোপান্নার জীবন বৃত্তান্ত)

কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি দাক্ষিণাত্য ও মুম্বাই প্রদেশের তীর্থস্থানসমূহ পরিক্রমাকালে কার্ত্তিক-ব্রত উপলক্ষে দক্ষিণ ভারতের বহু সুন্দর মন্দিরের মধ্যে ভদ্রাচলম্ নামক স্থানে পর্বতের উপর একটি সুন্দর মন্দির দর্শন করেন। এই মন্দিরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। কথিত আছে যে, এই বিগ্রহত্রয় পূর্বে কোন জঙ্গলের মধ্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত ছিল, দামাক্কা নাম্নী এক রাম-ভক্ত মহিলাকে স্বপ্ন দ্বারা জানান হয় যে, শ্রীবিগ্রহগণ মৃত্তিকা-নিম্নে আছেন এবং তাঁহাদিগকে উত্তোলন করিয়া সেবা-পূজার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবং শ্রীমতী দামাক্কা ততদিন পর্যন্তই সেবা করিবেন, যতদিন পর্য্যন্ত আর একজন রাম-ভক্ত আসিয়া সেবা গ্রহণ না করেন। শ্রীমতী দামাক্কা স্বপ্নাদেশ পালন করিয়া শ্রীরাম-সীতা ও লক্ষ্মণের শ্রীমূর্ত্তি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিয়া পূর্বোক্ত নির্দ্দেশমত স্থাপিত করিলে পর যথাযথভাবে তাঁহাদের সেবাপূজার কার্য্য আরম্ভ হইল।

খৃঃ ১৭০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ভদ্রাচলম্ এলাকা মোগল-বাদশাহগণের অধীনে গোলকোন্দা নবাবগণের জা'গীর বলিয়া কথিত ছিল। এই গোল-কোন্দার নবাবগণের মধ্যে একজন উপযুক্ত নবাব ছিলেন, যাঁহার নাম আবদুল্লা। এই নবাব-সাহেবের দুইজন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন, এই মন্ত্রীদ্বয়ের এক ভগ্নী ছিলেন, যাঁর পুত্রের নাম ছিল গোপান্না। শ্রীগোপান্না বাল্যকাল হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত ছিলেন। এমন কি, সময়ে এই বালক রাম-ভজন করিতে করিতে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারগ্রস্তও হইতেন। ক্রমে বালক উপযুক্ত হইলে তাহার মাতুলগণের সুপারিশে, শ্রীগোপান্না এই ভদ্রাচল অঞ্চলের তহশীলদার নিযুক্ত হইলেন। এই তহশীলদার "শ্রীগোপান্নাই পরে ভদ্রাচলমের রামভক্ত 'রামদাস' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।" তাঁহার জীবনে যে একটি সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে-সকল আদান-প্রদান ঘটিয়া থাকে, তাহা লোকচক্ষে

প্রাকৃত মনে হইলেও তাহা যে প্রাকৃত নহে, ইহাই আমাদের এই সত্য ঘটনা হইতে শিক্ষণীয় বিষয়।

শ্রীগোপান্না শুদ্ধ-ভক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সেব্য বিষয়-বিগ্রহের সেবানুকূল্যে তিনি সদসৎ যে-কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন,—ইহাই এই গল্পের লক্ষণীয় বিষয়। তিনি যখন বৃদ্ধা দামাক্কার নিকট হইতে ভদ্রাচলমের শ্রীরাম-মন্দিরের সেবা প্রাপ্ত হইলেন তখন সেবার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, ভগবানের মন্দির বিপুলভাবে সজ্জিত হউক; ভগবানের শ্রীমন্দিরে সেবা-পূজা এবং উৎসবাদির প্রচুর আয়োজন হউক, ভগবানের শ্রীঅঙ্গের ভূষণাদি মণি-মাণিক্যাদির দ্বারা সজ্জিত হউক এবং অজস্র নর-নারী ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জীবনকে ধন্যাতিধন্য করুক। কিন্তু মূলে তাঁহার নিকট অর্থ ছিল না। তাই তখন তিনি যে কার্য্য করিলেন, তাহা লোকচক্ষে গর্হিত বলিয়া মনে হইল এবং তাহার জন্য আরও অন্যান্য যাহা কিছু হওয়া উচিত, তাহা সবই হইল।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীগোপান্নার ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য্যই সাধিত হইল, যথা—শ্রীমন্দির খুব সুসজ্জিত হইল। শ্রীবিগ্রহগণ মণি-মাণিক্যদ্বারা শোভিত হইলেন, অজস্র লোক প্রসাদও পাইলেন; কিন্তু ফলে দেখা গেল যে গোলকোন্দা নবাবের তহবিল হইতে ছয় লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা (যাহার মূল্য ৮০,০০০০০ টাকা) উধাও হইয়া গিয়াছে। নবাব সাহেব তহশীলদার গোপান্নার নিকট হিসাব চাহিলে তিনি সত্য কথাই বলিলেন, কিন্তু নবাব সাহেব তাঁহাকে গোলকোন্দায় আনাইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন। এবং পিঞ্জরাবদ্ধ কয়েদী শ্রীগোপান্নাকে 'দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়' এই নীতি অনুসরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদান করিলেন। শ্রীগোপান্না এই সমস্ত শাস্তি 'তত্তেঽনুকম্পাং' ভগবানের কৃপা এবং আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন এবং মান-অপমান সকলেই নীরবে সহ্য করিলেন। একদিন দুইদিন নহে, সরাসরি ১২ বৎসরকাল শ্রীগোপান্নাজী ভগবানের এই ব্যতিরেক কৃপা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কায়-মনো-বাক্যে ভগবানের মানসিক সেবা করিতে লাগিলেন।

নবাব আবদুল্লা-সাহেব বেগমের সহিত রাজ-প্রাসাদে সুখে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন। হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলেন, দুইটি সুন্দর নব্য কিশোর বালক তাহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—"নবাব-সাহেব! আপনার যে-সমস্ত টাকা

গোপান্নার নিকট পাওনা আছে, তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন এবং আমাদের একটি প্রাপ্তিস্বীকাররূপ রসিদ দিন। আপনি গোপান্নাকে এই মুহূর্ত্তে মুক্ত করিয়া দিন, আমরা গোপান্নার কষ্ট আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।" নবাব সাহেব সেই সুন্দর মূর্ত্তি বালকদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; বালকদ্বয় জবাব দিলেন যে, তাহারা দুইজনেই শ্রীগোপান্নার অতি নিকট আত্মীয়। তাঁহাদের সূর্য্যবংশে জন্ম এবং তাহাদের নাম—শ্রীরামজী এবং শ্রীলক্ষ্মণজী। গোপান্নার সংস্রবে নবাব-সাহেবের শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দর্শন ঘটিল। নবাব-সাহেবের আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বালকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া গোপান্নার কয়েদখানায় উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বালক দুইটিকে অর্থের প্রাপ্তিস্বীকাররূপে রসিদ লিখিয়া দিলেন, বালকদ্বয় অদৃশ্য হইলেন।

নবাব সাহেবের স্বপ্ন এবং ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বালকগণকে এবং গোপান্নাকে খুঁজিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার শয্যাগৃহে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, কেবল ছয়লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা তাহার সম্মুখে স্তূপাকৃতিরূপে বর্ত্তমান। ভাগ্যবান নবাব-সাহেব ভক্তের মহিমা অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীগোপান্নাকে জেলখানা হইতে ডাকিয়া আনাইলেন এবং মুসলমানোচিত উপরে চাহিয়া 'আল্লার দোয়া' করজোরে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার মহিমা-বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পূজা করিলেন। তিনি গোপান্নাকে বলিলেন,—"আপনি প্রকৃতপক্ষেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন; আপনি মহা-ভাগ্যবান ব্যক্তি, আমি আপনাকে বুঝিতে পারি নাই, আমাকে ক্ষমা করুন। আর এই যে ছয়লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা আমার সম্মুখে স্তূপাকৃতি হইয়া আছে, ইহা আপনার শ্রীরামচন্দ্রেরই প্রদত্ত বস্তু—আপনি এইগুলি গ্রহণ করিয়া আপনার কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আপনি পুনরায় তহশীলদার পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছয়লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা আপনার ইচ্ছামত খরচ করিয়া ভগবানের সেবা করুন। আমি আজ হইতে ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি গোপান্না নামের পরিবর্ত্তে পরমভক্ত শ্রীরামদাস বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

আধ্যক্ষিকগণ প্রশ্ন করিবেন যে, শ্রীরামদাস গোপান্না যত বড়ই ভক্ত হউন না কেন, তাঁহার এই রাজকোষ হইতে তহবিল তছরূপ করা উচিত হইয়াছে কিনা? তাঁহারা বলিবেন,—এই কার্য্যের দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই দোষী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দোষের জন্য তাঁহার কারাগৃহ বাস এবং

শাস্তি প্রাপ্তি সকলই স্বাভাবিক হইয়াছে। গোপান্না যখন রাজার তহবিল ভাঙ্গিয়া ভগবানের সেবা করিতেছিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই তহবিল ভাঙ্গিয়া ভগবানের সেবাকার্য্য চালাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দোষ আরও অমার্জ্জনীয় হইয়াছিল, কেন না তিনি জানিয়া-শুনিয়াই এই অপকার্য্য করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ এই আধ্যাক্ষিকগণকে উত্তর দিবেন যে, মন্দির, পুষ্করিণী বা সেইপ্রকার সাধারণের ব্যবহারযোগ্য স্থানগুলির (Public Places) রক্ষণাবেক্ষণ করা বা তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করার ভার তদ্দেশীয় রাজার। রাজা যখন ঐ কার্য্যে অমনোযোগী ছিলেন, তখন সেই কার্য্য গোপান্না করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দোষ মার্জ্জনীয়। কিন্তু আবার একজন বলিবেন, যদিও তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য রাজকোষ ভাঙ্গিয়াছিলেন, তথাপি এই বিষয়ে তাঁহার রাজাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য ছিল। শ্রীগোপান্নার কয়েদবাস সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে একটি টিয়াপাখীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁহাকে দ্বাদশবৎসর জেলখানায় বাস করিতে হইয়াছিল।

আধ্যাক্ষিকগণ বলিবেন,—পূর্ব্বজন্মের কথা আনিবার প্রয়োজন কি? এই জন্মের কথাই ধরা হউক না কেন? তিনি ত' সোজাসুজি চুরি করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার জেল হইয়াছিল। অবশ্য পরে তিনি যে ভক্ত তাহা জানিয়া রাজা তাহাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়াছিলেন, একথাও সত্য। মাঝামাঝি লোক মধ্যস্থ করিবেন, ভগবদ্ভক্তের বিষয়ে বিচার করা সাধারণের কর্ত্তব্য নহে। কারণ সেইপ্রকার বিচারে সত্যানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে ভুল হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

সন্দিগ্ধচিত্ত-ব্যক্তিগণ ভগবদ্‌ভক্তের দুর্দ্দশার (?) কথা বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই অনেক প্রকার বিচার করিয়া থাকেন, সেইজন্য আমরা শাস্ত্রবিচার দ্বারা দুই একটি বিষয়ে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।' ভগবান ও ভক্ত উভয়েই যে ভূমিকায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের পরস্পর আদান-প্রদান করেন, তাহা অদ্বয়জ্ঞান ভূমিকা (Absolute Stage)। আর সাধারণ লোক যে ভূমিকায় আদান-প্রদান করেন, তাহা দ্বৈত-ভূমিকা (Relative Stage)। অদ্বয়জ্ঞান

ভূমিকায় ভাল-মন্দ সবই ভাল (All good), আর দ্বৈতজ্ঞান-ভূমিকায় ভাল-মন্দ সবই মন্দ (All nuisance)।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব-'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ,' এই সব 'ভ্রম'॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৬)

এই দুই ভূমিকার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে ভগবান্ ও ভক্তের কথা বুঝা যাইবে না। দ্বৈত ভূমিকায় দাঁড়াইয়া অদ্বয়জ্ঞান-ভূমিকার বিচার করিতে গেলে আমরা অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইয়া যাইব। ভগবদ্ভক্ত অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের সেবা করেন বলিয়া তাঁহারা যে-কোন অবস্থাতেই জীবন্মুক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। বদ্ধজীব জীবন্মুক্ত ভক্তগণের কথা বুঝিতে পারে না বলিয়া 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়'—এই কথা বলা হইয়াছে। দ্বৈত-জ্ঞান ভূমিকার অতিবড় বিজ্ঞজনও অদ্বয়জ্ঞান-ভূমিকার কথা বুঝিতে পারে না। অদ্বয়জ্ঞান ভূমিকার কথা শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা,—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥

যাহারা সদাসর্ব্বদাই অদ্বয়-জ্ঞান ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত, তাঁহারা যে কোন অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকুন না কেন, সর্ব্বদাই তাঁহারা জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকেন। শুদ্ধ-ভক্ত গোপাম্মা সর্ব্বদাই ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত। সুতরাং তহশীলদাররূপেও তিনি মুক্তপুরুষ এবং জেলের কয়েদী হিসাবেও মুক্তপুরুষ। মুক্তপুরুষগণ প্রাকৃত জগতের কোন আইনেরই অধীন নহেন। তাঁহারা 'দেবর্ষি ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাম্' ইত্যাদি কাহারও অধীন নহেন এবং ঋণীও নহেন; কারণ, তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই ভগবান্ হইতে অভিন্ন। ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত এবং ভগবানের সেবনীয় বস্তু—সমস্তই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু। একটি বস্তু অপর বস্তু হইতে পৃথক নহে।—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। ইহা প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও পরে দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে বুঝা যায়।

অপ্রাকৃত ভূমিকায়, আবশ্যক হইলে ভগবদ্ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য চুরি-ডাকাতি করিতে পারেন, সেইরকম ভগবানও ভক্তের জন্য চুরি-

ডাকাতি করেন। আজও রেমুণায় ভগবান্ গোপীনাথজী ভক্ত মাধবেন্দ্র-পুরীর ক্ষীরচুরি করিবার জন্য 'ক্ষীর-চোরা-গোপীনাথ' নামে অভিহিত হইতেছেন। তিনি 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামে যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা ভক্তগণের নিকট অতি উপাদেয় বস্তু। সেই প্রকার গোপাম্মাও যে ভগবানের জন্য চুরি করিয়াছিলেন, তাহাও ভক্তগণের নিকট অতি উপাদেয় বস্তু। সাধারণ লোক এই উপাদেয়ত্ব বুঝিতে পারিবেন না; কারণ, তাঁহারা দ্বৈত-ভূমিকায় অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২) বলেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি-কামনাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সমস্তই অতুলনীয় ও দেবতা-বাঞ্ছিত গুণ। 'অভক্ত-হীন-ছার' যতই প্রাকৃত গুণদ্বারা বিভূষিত হউক না কেন, সে মনোরথের দ্বারা অসৎ কার্য্য ছাড়া আর কিছুই করিতে সমর্থ নহে। অভক্তের নৈতিক-জ্ঞান ক্ষণ-ভঙ্গুর—অসৎ। অভক্তের অধ্যয়ন, জ্ঞান, কর্ম্ম, জাতি, জপ, তপ ইত্যাদি সমস্তই মৃতব্যক্তির সাজ-সজ্জার ন্যায় লোকরঞ্জনকর মাত্র। ভগবদ্ভক্তি অপ্রাকৃত ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহা প্রাকৃত গুণ-সমষ্টির সহিত তুল্য নহে।

একটি চাক্‌চিক্যময় লোহ-নির্ম্মিত বস্তু যতই মূল্যবান হউক না কেন, তাহা ক্ষুদ্র একগ্রেণ সোনা অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের বস্তু। সেইপ্রকার প্রাকৃত দ্বৈত-জগতের যে কোন উত্তম বস্তু, (আপাতদৃষ্টিতে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের। প্রাকৃত নীতির সহিত অপ্রাকৃত চৌর্য্যবৃত্তির কখনই তুলনা হয় না। অপ্রাকৃত রাজ্যে সমস্ত বিরুদ্ধ জ্ঞান বস্তুর সমন্বয় করাইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় প্রাকৃত বস্তুকে অনুৎকৃষ্ট এবং অপ্রাকৃত বস্তুকে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো-বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
(গীঃ ৭।৪-৫)

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই আটটি তত্ত্ব ভগবানের প্রকৃতি হইলেও এইগুলি অনুৎকৃষ্ট প্রকৃতি ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি উৎকৃষ্ট আছে, যাহা হইতে জীবকূল উৎপন্ন হয়। জীবকূল জড়-বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বলিয়াই তাহারা জড়াপ্রকৃতির উপর অযথা আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে।

'প্রাকৃত' এবং 'অপ্রাকৃত' বস্তুগত বিচারে এইরূপ পার্থক্য থাকায়, প্রাকৃত অবস্থায় অপ্রাকৃত বস্তুর বিচার চলে না। জীব ভগবানের পরা তটস্থাশক্তি-সম্ভূত। সুতরাং তাঁহার স্বরূপের কার্য্যগুলি জড়াপ্রকৃতির ভূমিকায় কার্য্য নহে। পরাশক্তি সূত্রে ভগবান্ এবং জীব সেব্য-সেবকভাবে নিত্য সম্বন্ধিত। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদীগণ এই মধুর সম্বন্ধের কথা বুঝিতে পারে না। সেই মধুর সম্বন্ধদ্বারা ভগবানের এবং ভক্তের মধ্যে যে আদান-প্রদান হয়, তাহাও অপ্রাকৃত। পরাপ্রকৃতি জড়াপ্রকৃতিকে ধারণ করে, কিন্তু জড়াপ্রকৃতি পরা-প্রকৃতিকে ধারণ করিতে পারে না। অতএব যেখানে পরাপ্রকৃতি কার্য্য করে সেখানে জড়াপ্রক্রতির কার্য্য স্তব্ধ হইয়া যায়, লৌহ অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত হইলে লৌহের কার্য্য স্তব্ধ হইয়া যায়, কিন্তু অগ্নির কার্য্য চালু থাকে।

ত্রিগুণময়ী মায়ার কবলে অভিভূত হইয়া মায়ামোহিত জীব-জগৎ এই প্রাকৃতাপ্রাকৃত বিচার করিতে অসমর্থ। যিনি ভগবানের পাদপদ্মে একান্ত-ভাবে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তিনিই এই ত্রিগুণময়ী মায়ার দুর্বার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন।—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

(গীঃ ৭/১৩-১৪)

শ্রীগোপান্না শরণাগত শুদ্ধভক্ত সুতরাং তাঁহার ক্রিয়াকলাপ প্রাকৃতজনের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। লোকচক্ষে রাজ-কোষ হইতে তহবিল তছরূপ করার অপরাধে তিনি কোনদিনই অপরাধী ছিলেন না। পূর্ব্ব-জন্মে তিনি যখন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তখন তাঁহার টিয়াপাখীকে অবৈধ বন্ধন করার জন্য তাহাকে এই জন্মে ১২ বৎসর জেলে যাইতে হইয়াছিল। সাধারণ লোককে তিনি নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিয়া সাবধান করিয়াছেন যে, তাহা জনিত-

অজ্ঞানিত বহু অপরাধের জন্য কি-প্রকার ত্রিতাপ যন্ত্রণা তাহাদের জন্য ভবিষ্যতে অপেক্ষা করিতেছে—ইহা যেন তাহারা স্মরণ করেন। আজ যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল আজই পাওয়া যায় না, কিন্তু কর্মচক্রের এমনই গতি যে, ছোট বড় সকলকেই আপন আপন কর্মফল ভোগ করিতে হয়। কেবলমাত্র ভগবদ্‌ভক্ত কর্মফল ভোগ করেন না। ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন,—

যস্ত্বিন্দ্র-গোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম—
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(ব্রহ্ম-সংহিতা ৫/৫৪)

ইন্দ্র গোপ-নামক ক্ষুদ্রকীটই হউক, বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্ম্মমার্গ-জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব-কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানদিগের কর্ম্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের তিরোভাব-তিথিতে অভিভাষণ

প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ-নিরাস ও বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুত-গৃহীতয়া ॥
(ভাঃ ১/২/১২)

ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"তদেব শ্রুত-গৃহীতয়া মুনয়ঃ শ্রদ্দধানা ইতি পাদত্রয়েণ তস্যা এব ভক্তেদৌর্ল্লভ্যং দর্শিতম্"। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি কোন একটি সুলভ মানসিক বৃত্তি নহে, পরন্তু অপর সাধারণপক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ বস্তু। ভক্তির সংজ্ঞা প্রকরণে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন—"ভক্তি মোক্ষলঘুতাকৃৎ এবং সুদুর্ল্লভ।" শুদ্ধভক্তগণ মোক্ষ-পদকে বা কৈবল্য-সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"কৈবল্যং নরকায়তে" ইত্যাদি।

অপ্রাকৃত "ভক্তি" যখন Sex religion অর্থাৎ প্রাকৃত "যৌনধর্ম্ম" নামে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা জগতে প্রচারিত হয় তাহাতে শুদ্ধভক্তি-সমাজ কিরূপ দুঃখ অনুভব করেন, তাহা বিবেচনীয়। সর্ব্বধর্ম-সমন্বয়বাদী কোন সাধক বা কল্পিত অবতার ভাগবত-ধর্মের যাজন করিয়া নাকি স্ত্রী-ধর্মের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছিলেন(?)। এইভাবে ভাগবত-ধর্মের অনেক অপবাদ এবং প্রাকৃত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, ভাগবত-ধর্ম বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত "প্রেমধর্ম্ম" ভাগবতের নির্দেশানুসারে "শ্রুত-গৃহীতয়া" বিধি-বিষয়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার গুরুবর্গের দ্বারা পরম্পরাসূত্রে ভাগবত-ধর্মের দার্শনিক বিচার এবং সর্ব্বোৎকর্ষত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। "শ্রুতগৃহীতয়া" বিষয়ে তিনি যে-সকল নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার আচার ও প্রচার দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অমল ভাগবত-ধর্ম সুরক্ষিত হইতে পারে।

শ্রীল জীব গোস্বামী-প্রভুপাদ বলেন যে, "সদ্গুরোঃ সকাশাৎ বেদান্তাদ্যখিল-শাস্ত্রার্থবিচার-শ্রবণদ্বারা যদ্যদিত্থাবশ্যক-পরমকর্ত্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে।" "সদ্গুরো সকাশাৎ" অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট হইতে বেদান্তাদি অখিলশাস্ত্রার্থ বিচার শ্রবণদ্বারা যে কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় তাহাই ভক্তিমার্গ, অন্যথা কৃষ্ণভক্তির নামে জগজ্জাল উৎপাতের সৃষ্টি হয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, পুরাণাদি শাস্ত্রকে বাদ দিয়া ভক্তির নামে যে ছলধর্মের আবাহন করা হয়, তাহা উৎপাত সৃষ্টি করে মাত্র। যদ্যপি ভক্তি-রাজ্যের অপার মহিমাবশতঃ ঐ ছলধর্ম বা সহজিয়াবাদ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ অপেক্ষা অনেক উচ্চ-স্তরে, তথাপি সেই ছলধর্ম বা প্রাকৃত সহজিয়াবাদ শ্রীল গোস্বামীপাদগণ কখনও অনুমোদন করেন না।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর পদাঙ্কানুসরণে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয় বিনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রবেশ-অধিকার লাভ হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শ্রুতিবৎ প্রামাণিক সরল বাঙ্গলা গীতাবলীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শ্রীল গোস্বামীগণের পদরেণু দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে আমরা "রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব" বুঝিতে ভুল করিব। তিনি বলিয়াছেন,—

"এই ছয় গোসাঞি যার, মুই তার দাস।
তা'সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥"
"রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি ॥"
—ইত্যাদি।

অতএব গোস্বামীপাদগণের বিচার পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রাকৃত সহজিয়াবাদ 'রাধাকৃষ্ণ ভজন' নামে প্রচলিত, তাহাতে জগতের উৎপাত ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি শ্রীভগবানে হ্লাদিনী-শক্তির লীলা বিশেষ ; তাহা কোন প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচার নহে। শ্রীল জীবগোস্বামীর আজ্ঞানুসারে 'সদ্গুরোঃ সকাশাৎ' বেদান্তাদি অখিল-শাস্ত্র-বিচার শ্রবণ না করিলে প্রাকৃত সহজিয়াবাদই প্রচারিত হয় এবং আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজ সেই সকল প্রাকৃত সহজিয়াগণের আচরণ লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব-ধর্মকে 'Sex Religion

...'নেড়ার' ধর্ম বলিয়া কদর্থ করে। ...ও রত্নাবলী তাহাতে শ্রীল গোস্বামীপাদ-
গণের সদ্ধর্ম্ম-প্রচার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্ভক্তি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপ্রেম-স্বরূপ। তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণময় ব্যভিচার নহে। ভগবৎপ্রেম লাভ হইলে প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লালসা কখনও মনে হইবে না। ইন্দ্রিয় তর্পণমূলেই আমাদের সংসার-বন্ধন। "কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥" যখনই জীব ভগবানের ইন্দ্রিয়—তর্পণ বাদ দিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হয়, তখনই সে মায়া দ্বারা কবলিত হইয়া পড়ে। আবার যখনই সে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ পরিহার করিয়া ভগবদিন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হয় তখনই সে 'মুক্তিপদ' ভগবানের শ্রীচরণ-সেবার অধিকার পায়।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৫)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 'মুক্তিপদের' সংজ্ঞা দিয়াছেন 'মুক্তির্হিত্বা অন্যথা রূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।' শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও সনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" সুতরাং 'কৃষ্ণদাস' যখন নকল কৃষ্ণ হইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে ত্রিশূলবিদ্ধ করিয়া সংসার কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণের অনুকরণ করিয়া যে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সাধনসিদ্ধ-অবস্থায় কৃষ্ণের সহিত এক হইয়া যাওয়ার অপচেষ্টা বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, তাহা শ্রীল গোস্বামীপাদগণের প্রদর্শিত পথ হইতে ভিন্ন। মায়াবাদ কল্পিত নির্ভেদ-ব্রহ্মানুন্ধান ভাগবত ধর্মের বিরুদ্ধ আচরণ। 'শ্রীমদ্ভাগবত' সেইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম নিরসন পূর্বক "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র" মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষবাদী বা কর্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের জন্য ভাগবত-ধর্ম নহে। তাহাদের ধর্ম্মসকল শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশক শ্রীল নারদমুনিদ্বারা "জুগুপ্সিত" ধর্ম্ম বা নিন্দনীয় ধর্ম্ম বলিয়া উপলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীল নারদ-মুনির পদাঙ্কানুসরণপূর্বক শ্রীমদ্ ব্যাসদেব মহামুনি ভাগবতের প্রথমেই বস্তুনির্দেশ-মঙ্গলাচরণে ধর্মার্থ কাম-মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামী 'প্র'-শব্দে "প্রকৃষ্ট-রূপেন মোক্ষবাঞ্ছাপি নিরস্তঃ" করিয়াছেন। ধর্মার্থ-কাম মোক্ষ-বাঞ্ছাযুক্ত ব্যক্তি কখনও নির্মৎসর হইতে পারে না; কারণ তাহারা সকলেই কামনাযুক্ত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করিয়া যাহারা অন্তিমে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের বহু পূর্বেই কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ঐরূপ অপসিদ্ধান্তদ্বারা চালিত হইয়া বাহ্যিক বৈষ্ণব-বেশ-ধারণই কৈতবধর্ম; তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত এবং গোস্বামীপাদগণের বিচার-নৈপুণ্যে সদ্ধর্ম বা ভাগবত-ধর্ম নামে চলিতে পারে না।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ এতৎসম্পর্কে "সালোক্যাদি সর্বপ্রকার মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" বলিয়াছেন। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম। কারণ 'ভক্তি'-শব্দের অর্থই কৃষ্ণপ্রেম। প্রেম বিনা সেবা শুদ্ধ হয় না। কর্মি-জ্ঞানি-যোগী নিষ্কাম না হওয়ায় তাহারা কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণ প্রেমলাভে-অযোগ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্ত-নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত সকল কামনা-বাসনাই ইন্দ্রিয় তর্পণমূলক। ঐরূপ অন্যাভিলাষ-পরায়ণ কামুক ব্যক্তি কখনই অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তা কংসেরও ছিল। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে—এই চিন্তায় অধীর হইয়া কংসের সর্বত্র এবং সকল সময়েই আহার-বিহার, শয়ন-স্বপন, ঘরে-বাইরে কৃষ্ণস্ফূর্তি হইত। সর্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্তি হওয়া মহাভগবতের লক্ষণ; কিন্তু প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তার জন্য কংস কৃষ্ণ-ভক্তির অধিকারীই হন নাই। প্রতিকূল কৃষ্ণচিন্তার দ্বারা মোক্ষও প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"—ইহাই সাত্বত-শাস্ত্রের বিচার।

কৃষ্ণবিদ্বেষী কংস জরাসন্ধ প্রভৃতিকে কৃষ্ণ সাযুজ্য-মুক্তি পর্য্যন্ত দিতে পারেন। যে সাযুজ্য-মুক্তি পাইবার আশায় বড় বড় জ্ঞানি-সন্ন্যাসী-ঋষি-মুনিগণ বহু কৃচ্ছসাধনায় নিযুক্ত হন, সেই-সাজয্য-মুক্তি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী অসুরগণও কৃষ্ণদ্বারা নিহত হইয়া প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তিযোগদ্বারা অনুকূল কৃষ্ণ-সেবাদ্বারা যে মোক্ষ-সন্ধি কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু; তাহা কৃষ্ণ সকলকে সহজে প্রদান করেন না। "আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই" কৃষ্ণ প্রেম-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়; সুতরাং সেই কৃষ্ণপ্রে

প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ নহে। অপ্রাকৃত পারকীয়ভাব প্রাকৃত ভূমিকায় আলোড়ন করিয়া যে কৃষ্ণানুসরণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণানুকরণ-পদ্ধতি, তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ও মূলে মৎসরতা। কৃষ্ণের প্রতি মৎসরতা করিয়াই বহুপ্রকার ছল-ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলেও তাহা গোস্বামীপাদগণের প্রবর্ত্তিত নানাশাস্ত্র-বিচার-পর সদ্ধর্ম্ম নহে।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ সেই সদ্ধর্ম্ম পালনকারীর সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্য্যত্বেন নির্ম্মৎসরাণাং ফলকামুকস্যেব পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরতা তদ্রোহিতানামেব তদুপলক্ষত্বেন পশ্চালম্ভনে দয়াপুনামেব চ সতাং স্বধর্ম্মপরাণাং বিধীয়তে।"

অর্থাৎ সেই ভাগবত-ধর্ম্ম একমাত্র কৃষ্ণ-সেবানুকূল তাৎপর্য্যজনিত ফলকামনাযুক্ত পরোৎকর্ষ-অসহনশীল মৎসরতা-পরিত্যাগপরায়ণ এবং পশুহিংসাপর কর্ম্মকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত স্বধর্ম্ম-পরায়ণগণই পালন করেন।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমনকি তিনি নিজ হাতে পত্রিকটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে রাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন-যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকায় নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট'।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১০টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শ'।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এইখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এইরকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চৌদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।